সীমারেখা

GB10026

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হাউস অব বুকস্
৭২, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা—৯

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়,

সুহৃদ্বরেষু—

এই গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে কোনভাবেই কটাক্ষ করা হয়নি। তবুও যদি কোথায়ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তবে সেটা নিতান্তই আকস্মিক।

—লেখক

নেতাজী সুভাষ আর রবার্ট ক্লাইভ।

কি বিচিত্র ভাবেরই না উদয় হয় মনে যদি এক পংক্তিতে দু'জনের নাম বসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দু'জনেই যে মহাপুরুষ এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে কি? তবে একজন শুধু মহাপুরুষ তাঁর দেশবাসীর কাছে, আর একজন বিশ্ব-বাসীর কাছে। একজন অপরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে দেশবাসীকে অক্ষয় স্বর্ণখনির সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন, আর একজন নিজের জীবন দিয়ে দেশবাসীকে দান করতে চেয়ে-ছিলেন পরমপ্রিয় স্বাধীনতা। অপরের এক কাণাকড়ির প্রতিও তাঁর লোভ ছিল না। ছিল না কারও স্বাধীনতা অপহরণ করবার পাশবিক প্রবৃত্তি। তাই তিনি সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তাই জগতের আত্মদানকারী বীরের তালিকায় সর্ব্বাগ্রে তাঁর নাম চির-দিনের মত অক্ষয় হয়ে রইল। অপরজনের নাম চিরকাল ইতিহাসে পরস্বাপহারী দস্যুরূপে কুখ্যাত হয়ে থাকবে। অবশ্য তাঁর স্বদেশীয়েরা তাঁর স্মৃতি পূজা না করে পারবে না। কারণ

তাঁরই দৌলতে তাঁর স্বদেশ আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। কিন্তু ইতিহাসই একদিন তাদেরকে শিক্ষা দেবে যে, অপরের ধনদৌলত অপহরণ করে চিরদিন শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা যায় না ; যেমন পারে নি গজনী, বোগদাদ, ইরাণ, আরব বা মোঙ্গলরা।

তাই যখন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নাম ধারণকারী টিনের পাতগুলো অকস্মাৎ একদিন অন্তর্হিত হলো এবং তাদের স্থান অধিকার করে দেখা দিল এমন একজনের নাম, যাঁর নাম লেখা রয়েছে আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে তখন ঐ রাস্তারই বিরাট এক অট্টালিকার তেতলায় অধিষ্ঠিত মিত্র এণ্ড কোম্পানীর বড় সাহেবের ষ্টেনোগ্রাফার অজয় কি জানি কেন খুসী হতে পারে নি। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল রাস্তার নাম পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি রাস্তার অধিবাসীদের মনটা এক শতাংশও বদলে যেতো তবেই নামকরণ উৎসবের খানিকটা সার্থকতা থাকতো। বরং এই নাম পরিবর্ত্তনের সুযোগ নিয়ে আরও কত প্রকারে দেশের সর্ব্বনাশ করা যায় তারই মতলব সে লক্ষ্য করেছে এই রাস্তার মালিকদের মুখেচোখে।

এই ক্লাইভ ষ্ট্রীট শুধু বাংলার নহে সমগ্র ভারতের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তৃত্ব করে আসছে গত দেড়শো বছর ধরে। এই রাজপথের চতুষ্পার্শ্বের প্রাসাদোপম গৃহগুলির প্রতিটি ইষ্টকে রয়েছে কোটী কোটী ভারতবাসীর শোণিত আর পুঞ্জীভূত

হতাশা। এই জন্যেই বোধহয় এর সামনের দীর্ঘিকার নাম রাখা হয়েছে লালদীঘি। লাল মানুষেরা কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের লাল রক্ত পান করে আরামের যে নিঃশ্বাস ছাড়ত তার থেকে বিগলিত শোণিত কণা জমেজমে এই দীঘির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সবই লাল! একপাশে রাজদণ্ডের ধ্বজা-ধারণ করে লাল দপ্তরখানা, আর তাকে ঘিরে সেই ধ্বজার আশ্রয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অগণিত রক্তশোষণকারী অট্টালিকার সারি। রক্তশোষণের ফলে তাদেরও রক্তিমাভা যেন দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে প্রত্যহ আসে রক্তদান করতে। আর যারা আসে না তারাও এখানকার চুম্বকাকর্ষণ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। সুদূর পল্লী অঞ্চলেও এদের জাল পাতা রয়েছে। এক অদৃশ্য টানে এরা সকলকেই অহরহ টানছে। নিস্তার নেই, নিষ্কৃতি নেই!

অজস্র নরনারীর আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে যখন কলকাতার শ্রেষ্ঠ নাগরিক রাজপথের নূতন নামকরণ করলেন তখন অজয়ের মনটা বেদনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। চোখের সামনে সে স্পষ্ট দেখতে পেল যে কাল থেকেই রক্তশোষণকারীরা প্রতি অফিস কক্ষে, অলিন্দে এবং গৃহশীর্ষে নেতাজীর প্রতি-কৃতি সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করবে। অফিসের চিঠির প্যাডে, ফাইলে এবং অন্যান্য কাগজপত্রে ক্লাইভ কথাটির পরিবর্ত্তে বসবে "নেতাজী সুভাষ"। কিন্তু তাদের মনের বা হৃদয়ের কি একটুও পরিবর্ত্তন হবে? হবে না। বরং এই মহাপুরুষের

নামের আড়ালে থেকে শোষণ কার্য্য চালাতে এদের আরও সুবিধেই হবে। তাই অজয় ভাবতে লাগল এই নামকরণের ফলে নেতাজীকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানানোর বদলে যেন অসম্মানই করা হয়েছে। নেতাজী যদি একথা শুনতে পান তবে বেদনায় তাঁর দয়ার্দ্র বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে হয়তো।

ধরা যাক্ না এই মিত্র এণ্ড কোম্পানীকেই। কি করে একটা ভূয়া প্রতিষ্ঠান অল্পদিনের মধ্যেই ফেঁপে উঠেছে অজয় তা' চোখের সামনেই দেখেছে। দক্ষিণ কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ প্রতাপচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র সুবোধ দশ বছর বিলেতে থেকেও যখন আই, সি, এস তো দূরের কথা ব্যারিষ্টারীটা পর্য্যন্ত পাস করতে পারল না তখন ব্যারিষ্টার সাহেব পুত্রকে দেশে ফিরিয়ে আনলেন। তার কিছুদিন পরেই যুদ্ধ বেধে উঠে। সুচতুর ব্যারিষ্টার সাহেব পুত্রকে এক ঠিকা-দারীর ব্যবসা জুটিয়ে দিলেন। দশ বছর বিলেত থাকার ফলে সুবোধ চাল-চলন, বাঁকা ঠোঁটের ইংরাজী এবং মদ্য ও আনুষঙ্গিক জিনিষগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে খুবই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আর ঠিকাদারী কাজটাও নির্ভর করে প্রধানতঃ এই কয়টি সদ্‌গুণের উপর, তাই সুবোধ অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসা জাঁকিয়ে বসল। এখন ডালহৌসী স্কোয়ারে বিরাট এক অফিসের মালিক সে। লোহা, সিমেণ্ট, ঔষধপত্র, কাপড় প্রভৃতি নানা জিনিষপত্রের দালালী করা এখন তার প্রধান ব্যবসা, ঠিকাদারীটা নামে মাত্র টিকিয়ে রেখেছে। এই

দালালীর সুড়ঙ্গ পথে কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে যাওয়া আসা করে তা' অজয় খুব ভাল ভাবেই জানে। খুব ভাল ইংরাজী জ্ঞান এবং সুন্দর চিঠিপত্র লিখতে পারে বলেই সুবোধ অজয়কে একটু খাতির করে। তার চাকরীও এখানে এজন্যেই হয়েছিল।

সেদিনটা ছিল সোমবার। বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। ট্রামে বাসে অসম্ভব ভীড়। চিরাচরিত প্রথামত ঠিক অফিসের সময়টিতে বৃষ্টিটা খুব চেপে এলো। ঠিক এই দিনটিতেই মিত্র এণ্ড কোম্পানীর মালিকের খেয়াল হলো যে কেরাণীরা ঠিক মত অফিসে আসে কি না একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক্। প্রকাণ্ড বুইকে চেপে দুধারের পথচারীদের গায়ে প্রচুর জল ও কাদা ছিটিয়ে মিত্রসাহেব দশটার পূর্ব্বেই অফিসে এসে হাজির হলেন।

তেতলার সিঁড়ির ঠিক মুখটার সামনেই বিরাট অফিস-ঘর! জল, বৃষ্টি মাথায় করেও অনেক কেরাণী ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। মিত্রসাহেবকে দেখেই সবাই কাজে মন দিল। সমস্ত কক্ষে অদ্ভুত এক নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। মাঝে মাঝে শুধু টেবিলঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ আর কেরাণী-দের সামান্য ফিস্‌ফিস্ কথাবার্ত্তা। উর্দ্দিপরা দু'একজন চাপরাশীকে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। কক্ষের একধার ঘেঁষে খুপরি খুপরি কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরির মাথায় ঝুলান সাইনবোর্ড কক্ষের অধিষ্ঠানকারীদের

পদ ও মর্য্যাদা ঘোষণা করছে। এই কুঠরিগুলির ঠিক বিপরীত দিকে বেশ বড় একখানা ঘর দেখা যাচ্ছে। তা'তে সাইনবোর্ড নেই। তবে ঢুকতেই দরজার গায়ে পিতলের ফলকে অঙ্কিত ঝক্‌ঝকে লেখা থেকে কক্ষের মালিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই গুরুত্বপূর্ণ কক্ষের দরজার তুই পার্শ্বে সদ্য ইস্ত্রি করা উর্দ্দি পরিহিত দু'জন চাপরাসী সশব্যস্তভাবে বসে আছে এবং অফিস কক্ষের প্রবেশপথের দিকে বারেবারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই প্রায় ছুটতে ছুটতে একজন যুবককে আসতে দেখা গেল। তাকে দেখেই একজন চাপরাসী সেই গুরুত্ব-পূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করল, আরেকজন আগমনকারী যুবকের পানে এগিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "অজয়বাবু, আপকা এত্তা দের্ হো গয়া, সাহেব তিনদফে আপকা পত্তা লগায়া। যাইয়ে, জলদি যাইয়ে।"

"সাহেব আজ দশটার মধ্যেই চলে এলেন?"

"জী, হ্যাঁ।"

"আচ্ছা যাচ্ছি," বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না নিয়েই অজয় মিত্রসাহেবের ঘরে গেল। মুখে অপরিসীম বিরক্তির ভাব নিয়ে মিত্রসাহেব বললেন, "এই যে অজয়বাবু, you are half-an-hour late to-day?"

"হ্যাঁ, স্যার। I am sorry, কিন্তু পরপর চারটা ট্রামেও যখন জায়গা পাওয়া গেল না তখন শেষটায় ঠেলা-

ঠেলি করে বাসেই আসতে হলো। না হয় আরও দেরী হয়ে যেতো।"

"তা' আগেই বাসে চড়লে হতো। Everybody should be punctual in his duty."

"বাসেও স্যার ঐ একই অবস্থা। তবে ট্রামেই আমি আসি। যাতায়াতে চারটে পয়সা বেঁচে যায়।"

"That can't be an excuse. যাক্‌গে আজকে আমি সবাইকে warn করে দিয়েছি। Office is office. কে ট্রামে এলো আর কে বাসে এলো তা'তে দুটো একটা পয়সা বাঁচলো কি না that's not my look out. এরপর যদি কেউ late করে আসে তবে আমি disciplinary action নিতে বাধ্য হব।"

অজয় নতনেত্রে নখ খুঁটতে খুঁটতে তার নির্দ্দিষ্ট P. A. এর চেয়ারে গিয়ে বসল। তার মুখে চোখে অপমান ও গ্লানির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

একটু পরেই মিত্রসাহেব বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, দেখুন অজয়বাবু আরেকটা difficulty arise করেছে। Establishment-এর রোহিণীবাবু তিনমাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। তাঁর নাকি টি, বি হয়েছে। এতদিনের ছুটি অবশ্য আমি দিতে পারব না। আর যে অসুখ করেছে তা'তে হয়তো তাকে আর সেরে উঠতে হবে না। সেরে উঠলেও এখানে আর তার স্থান হবে না। যত

সব nasty habit-এর লোক টি, বি, হবে না তো কি হবে ?”

অত্যন্ত বিনীতভাবে অজয় বলল, “রোহিণীবাবুকে স্যার কিছু সাহায্য করা যায় না কি ? চারপাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে উনি যে কি করে কি করবেন ? চিকিৎসা তো দূরের কথা চাকরী গেলে তো ওরা না খেতে পেয়ে মারা যাবে।”

“I can't help. My office is not a vagrant's house. আপনাকে establishmentএ যেতে হবে। আর……”

বাধা দিয়ে অজয় বলে উঠল, “আমি তো স্যার ষ্টেনোগ্রাফার হয়ে এখানে ঢুকেছি। establishmentএ আমি……”

“How funny, duty is duty ! যেখানে কাজের দরকার সেখানেই কাজ করতে হবে। Authority যা বলবেন সেইমত চলতে হবে। এর মধ্যে পছন্দ অপছন্দের কথা তুললে তো আর চাকরী করা যায় না।”

“তা তো বটেই।” অজয়ের সুরে হতাশা।

“আর দেখুন, এখানে ষ্টেনোর কাজ চালাবার জন্যে একজন নূতন লোক appoint করব। একটা advertisement draft করুন তো।”

অজয় কাগজ কলম নিয়ে বসতেই মিত্রসাহেব বললেন, “আচ্ছা লিখুন, আমিই বলে যাচ্ছি। Wanted a young,

smart and goodlooking lady stenographer for the Managing Director of a renowned mercantile firm. Pay......"

"Rs. 80/- + Dearness......"

"Oh no, no! ৮০৲ টাকায় ভাল lady stenographer পাওয়া যাবে না।"

"Excuse me, sir! আমি ভাবছিলাম, আমি যা পাচ্ছি......"

"তাই কি lady-কে দেওয়া যায়? লিখুন Pay Rs. 200/- + D.A. Rs. 50/-, Apply to Box No. etc. এটা আজই টাইপ করে সব কটা ইংরেজী কাগজে পাঠিয়ে দিন। আর আপনি establishmentএ চলে যান। আমি বেরোচ্ছি, আজ আর বোধহয় অফিসে আসব না।" পাইপ টানতে টানতে মিত্রসাহেব বেরিয়ে গেলেন।

টাইপ শেষ করে অজয় অফিস কক্ষে এলো। মুখ-খানা তার গম্ভীর। কর্ম্মরত কেরাণীরা তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। একাউন্টেন্ট অক্ষয়বাবু সবার চেয়ে প্রবীণ। সরল, অকপট ও সত্যাশ্রয়ী বলে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। অজয়কে তিনি অত্যন্ত ভাল-বাসেন। তিনিই প্রথমে কথা বললেন, "কি ব্যাপার অজয় লেট-এ আসার জন্য বকুনি খেয়েছো বুঝি।"

"তা গ্রাহ্য করি নি। মালিকের গালাগাল তো

কেরাণীর অঙ্গের ভূষণ। এবার বোধহয়........যাক্‌গে। আজকে আপনারাও কি.........?'' ক্ষোভের সঙ্গে অজয় বলল।

একই সুরে অক্ষয়বাবু বললেন, "সে অপমানের কথা আর বলো না বাবা। এসে দেখি দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমার আসতে একমিনিট দেরী হয়েছিল সে কি গালাগাল।''

টাইপের রমেশবাবু বললেন "দু'দিন লেট হলে একদিনের মাইনে তো কেটে নেওয়াই হচ্ছে, তার উপর আবার গালাগাল।"

"এটা উপরিপাওনা ভায়া," বিদ্রূপের হাসি হেসে অক্ষয়-বাবু বললেন।

গালাগালের জ্বালাটা রমেশবাবুর বোধহয় একটু বেশীই লেগেছিল। আবেগের সঙ্গে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "কি করে যে দশটায় হাজিরা দিতে হয় তা' একমাত্র ভগবানই জানেন। বাড়িতে তো আর আমাদের পাঁচটা চাকর দাসী নেই যে ঘুম থেকে উঠে চা খাব, খবরের কাগজ পড়ব, আর যথাসময়ে চান খাওয়া সেরে অফিসে চলে আসব? সূর্য্য উঠবার আগে থেকেই যে কত জায়গায় গিয়ে লাইন লাগাতে হয় তা' কর্ত্তৃপক্ষ বুঝবেন কি করে? রেশন আনা আর গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করা যে একই ব্যাপার তা বোঝাব কাকে? সস্তায় একটা জিনিষ যোগাড় করবার জন্যে

কত জায়গায় যে ঘুরতে হয় তাই বা বলব কাকে ? তারপরে অফিস টাইমে ট্রামে বাসে উঠা যে কি সুখের ব্যাপার তা কলকাতার চৌদ্দ আনা লোক জানলেও কর্ত্তাদেরতো আর জানার কথা নয়।"

আবেগের ছোঁয়াচ অক্ষয়বাবুর গায়েও লেগেছিল। তিনিও বলতে গেলেন, "তারা আর জানবেন কোত্থেকে বল ভায়া! মোটরের দরজাটা পর্য্যন্ত যাঁদের খুলতে হয় না, গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমুতে ঘুমুতে যাঁরা অফিসে আসেন তাঁদের তো আর আমাদের দুঃখ বোঝবার কথা নয়। তা নিয়ে আপশোষ করে আর লাভ কি ? ওসব কথা ছেড়ে দাও। তারপর অজয়, তুমি যেন কি বলতে যাচ্ছিলে"—

"হ্যাঁ। আমার চাকরী বোধহয় এবার গেল।"

"কেন, কেন, কেন হে !"

"এই দেখুন," অজয় টাইপ করা কাগজটা অক্ষয়বাবুর হাতে তুলে দিল।

"তাইতো হে, ব্যাপার কি ? হঠাৎ লেডী টাইপিষ্ট চাই ?"

"রোহিণীবাবুকে ছুটি দেওয়া হবে না। তাঁর জায়গায় আমাকে কাজ করতে হবে। আর আমার জায়গায় লেডী টাইপিষ্ট।"

"বল কি ? রোহিণী বেচারাকে তা'হলে মরতেই হলো!"

রমেশবাবু বললেন "এতক্ষণে মরে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কাল সন্ধ্যায় ওর বাসায় আমি গিয়েছিলাম। যা দেখলাম…"

ব্যাকুলকণ্ঠে অক্ষয়বাবু বললেন, "কি, কি দেখলে? এখন সে একটু ভাল আছে কি?"

"না, ভাল আর কোথায়? কাল বিকেলে দু'বার রক্তবমি হয়েছে। আমাকে তো প্রায় চিনতেই পারল না। আমার তো দেখে মনে হলো প্রায় হয়ে এসেছে।"

অক্ষয়বাবু বিমূঢ়ের মত জানলার মধ্যে দিয়ে গঙ্গার উপরে ধূম্রমলিন পরিদৃশ্যমান আকাশের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "হায়রে অদৃষ্ট! এই রোহিণীকে, বুঝলে অজয়, আমি দিনের পর দিন রাত ন'টা পর্য্যন্ত এই অফিসে খেটে মরতে দেখেছি, দুরন্ত গরমেও সে ফ্যানটা পর্য্যন্ত খোলে নি। অফিসের একটা পয়সা বাঁচাবার জন্য সে প্রাণপাত করেছে। আর আজ তার ছেলেমেয়েরা রাস্তার ভিখিরী হতে চলল।"

"সাহেব তো বললেন nasty habit, তাই টি, বি, হয়েছে।"

অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে অক্ষয়বাবু বললেন, "তাতো বলবেনই। আমাদের nasty habit না হলে ওদের সাহেবী চাল চলবে কোত্থেকে?"

ত্রস্তভাবে রমেশবাবু বললেন, "আরে চুপ, চুপ, মোহিনীটা শুনতে পাবে। একের নম্বরের চুকলিখোর, এ সব কথা সাহেবের কানে গেলে একটা অনর্থ বাধবে।"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অক্ষয়বাবু বলে যেতে লাগলেন

"তা' বাধুক। রেগে গিয়ে আর আমাদের করবেনটা কি? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বই তো নয়। যা' মাইনে পাই তাতে মাসের অর্দ্ধেকও চলে না। এমন দোর নেই যেখানে ধারের জন্য হাত না পেতেছি। আজ জীবনের শেষে মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত। ম্যাট্রিক পাশ করতে না করতেই ছেলেটাকে ফ্যাক্টরীতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। অথচ পড়াশোনা করবার জন্যে ওর কত ইচ্ছে ছিল। দু'টি মেয়ে ঘাড়ের উপর ঝুল্‌ছে। ষোল, সতেরো বছর বয়সেই ওদেরকে যোগিনীর বেশ ধরিয়েছি। ওদের মুখের দিকে তাকালেই আমার বুক ফেটে যায়। গৃহিণী আজ তিন মাস শয্যাগত, এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারছি নে। আমাদের মত কেরাণীর চেয়ে পৃথিবীর দীনতম ভিক্ষুকও ঢের ভাল। মিথ্যা সম্মানের মোহে তাদেরকে প্রাণান্ত হতে হয় না। আমরা না জানি ভিক্ষা করতে, না জানি নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে। তাই তো, বুঝলে অজয়, তাই তো মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে বলি, 'হে পরমেশ্বর, তোমার দয়া তো অসীম! তারই একটু কণা বিতরণ করে এই কেরাণী-জাতটাকে একদিনে উচ্ছন্নে দিয়ে দিতে পার না। তিলে-তিলে তাদেরকে মেরে তোমার কি লাভ হচ্ছে?"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে অজয় বলল, "কাকাবাবু এই মনোবৃত্তি আমাদের ছাড়তে হবে। মানুষের মত বাঁচবার অধিকার সকলেরই আছে। সেই বাঁচবার চেষ্টায় আমাদের এগিয়ে

যেতে হবে। খাঁচায় আবদ্ধ জানোয়ারের মত তিলে তিলে মরে লাভ কি ?”

“তা’ বাবা দেখ তোমরা যদি পার। আমাদের দিন তো শেষ হ’য়ে এলো। নিজের পাপের বোঝা সন্তানের ঘাড়ে নামিয়ে দিয়ে এখন পরপারের কড়ি গুণছি। তোমরা যদি সমবেত চেষ্টায় এই হতভাগ্য কেরাণী-জাতটাকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পার তবে স্বর্গ অথবা নরক যেখানেই থাকি দু’হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করব বাবা।”

“পারতেই হবে, আমাদেরকে পারতেই হবে। অদৃষ্টকে দোষারোপ আর ভগবানকে ডাকার দিন চলে গেছে। আজ সমগ্র পৃথিবীতে চলছে ‘স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। আমাদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। মুক্তকণ্ঠে আজ ঘোষণা করতে হবে অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, চাই মাথা গুঁজবার ঠাঁই, আর চাই প্রতিষ্ঠিত হতে আত্মমর্য্যাদায়। ভগবান প্রদত্ত আলো-বাতাসের মত এসবেও আমাদের জন্মগত অধিকার রয়েছে। ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, নিষ্ঠার পথে আমরা সংগ্রাম করে যাব। মরি তো সবাইকে নিয়ে মরব, আর বাঁচি তো সবাইকে টেনে তুলব। ইঁদুরের মত আর যাঁতাকলে আমরা মরতে রাজী থাকব না। আজ সবাইকে ডেকে বলতে হবে......”

ভীত-ত্রস্ত-কণ্ঠে রমেনবাবু বলে উঠলেন, “ওরে বাপু

বক্তৃতা থামাও। এটা যে মহামান্য মিত্র এণ্ড কোম্পানীর অফিস সেটা কি তোমরা ভুলে গেলে ?"

"তাতে আর হয়েছে কি ? এখানে তো আমরা সবাই এক।"

হা-হা করে রমেনবাবু হেসে উঠে বললেন, "তুমি দেখছি বাপু এখনও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাও নি। কথায় আছে যে, কাকের মাংস কাকে খায় না কিন্তু কেরাণীরা যে শকুনি তা' কি তোমার জানা নেই। আমরা যে নিজেদের মাংস নিজেরা খেতে ভালবাসি। তা' নাহলে লোকে আমাদেরকে কেরাণী না বলে মানুষই বলত।"

"রমেনবাবু, তা' আমি জানি। দারিদ্র্যই আমাদেরকে অমানুষ করে তুলেছে। দারিদ্র্যের তাড়নাতেই আমরা কর্তৃপক্ষকে খুসী করতে চাই ; কাণ ভাঙ্গিয়ে যদি বিনিময়ে কিছু খুদ-কুঁড়া মিলে। যদি সবাই মিলে মূলে আঘাত করতে পারি তবেই এই মনুষ্যত্বের নিত্য অপমান থেকে আমরা বাঁচতে পারব।"

পুনরায় ব্যাকুল কণ্ঠে রমেনবাবু বললেন, "ওহে থাম থাম ঐ দেখ মোহিনীটা আবার আসছে।

মোহিনী এসে অজয়কে জিজ্ঞেসা করল, "অজয়বাবু সাহেব কি বেরিয়ে গেলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আজ আর ফিরবেন না ?"

"তাইতো বলে গেলেন। কেন, কিছু দরকার আছে নাকি ?"

"সাহেব বাড়ীর জন্যে কয়েকটা জানলার পর্দা কিনতে বলেছিলেন। দু'ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে কয়েকটা স্যাম্পেল এনেছি।"

"তা' আজ আর বোধহয় আসবেন না।"

"তা' হলে সাহেবের বাড়িতেই যেতে হল দেখছি। মেমসাহেবকে দিয়ে approve করিয়ে নেব।"

রমেশবাবু বলে উঠলেন "নিশ্চয়, তাহ'লে তো যেতেই হবে।"

মোহিণী চলে গেল।

রমেশবাবু যেন একেবারে ফেটে পড়লেন, "দেখেছ অজয়, আমরা মরে গেলেও পাঁচ মিনিট ছুটি পাইনে আর ইনি জানলার পর্দা, সিনেমার টিকিট, ডিমওয়ালা মুর্গীর সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন।"

অক্ষয়বাবু বললেন, "আহাহা, তাতে এত চটছো কেন ? এইতো নিয়ম।"

রমেশবাবুর রাগ কিন্তু তখনও যায়নি। তিনি একই সুরে বলতে লাগলেন "দেখ, একজন সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মরবে, আরেকজন স্ফূর্তি করে বেড়াবে অথচ special increment ও personal allowance তারই হবে এ অবিচার আর সহ্য হয় না।"

"সহ্য করতেই হবে যতদিন না প্রতিকারের ক্ষমতা আমরা অর্জ্জন করতে পারি।"

"বুঝলে অজয়, এক একবার এমন রাগ হয়," একটু নিম্নকণ্ঠে রমেশবাবু বলতে লাগলেন, "যে দিই ব্যাটাকে ফাঁসিয়ে। জাল ওষুধ, ভূয়া পারমিট আর মেয়েমানুষের দালালী করে বেটা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। শুধু চাকরীর ভয়ে সামলে থাকি।"

"আমাদের দুর্ব্বলতা তো এইখানেই। না হ'লে এরা যে দেশের কি সর্ব্বনাশ করছে তা' বলে শেষ করা যায় না। অথচ আমরা জেনেও কোন প্রতিকার করতে পারছিনে। চাকরীর মায়া!"

এমন সময় হঠাৎ একটি বালকের ক্রন্দনের স্বরে সবাই সিঁড়ির দিকে তাকালেন। একটি বারো তেরো বছরের ছেলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মিত্র এণ্ড কোম্পানীর অফিসে এসে ঢুকল। রমেশবাবু তাকে দেখেই একেবারে ছুটে গেলেন। ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন "কি হে! রোহিণীর খবর কি?" তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের রোহিণীর ছেলে।"

"বাবা আজ এগারোটার সময়..." কান্নায় ছেলেটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

একসঙ্গে সবাই হায় হায় করে উঠলেন। অজয় বলে উঠল, "কাকাবাবু, আমি চল্লাম।"

রমেশবাবু বাধা দিলেন, "কি করে যাবে? সবে একটা বাজে। সাহেবও অফিসে নেই। কার হুকুমে যাবে?"

"তা' হোক্‌গে, আমি চল্লাম।" ছেলেটির হাত ধরে অজয় চলে গেল।

অক্ষয়বাবু বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রমেশবাবু জানলার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। তাঁর চোখেও জল।

তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে।

ভোরের আলো কলকাতার সব বাড়িতে না পৌঁছালেও প্রতাপাদিত্য রোডের তেতলা এক বাড়ির একতলার জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। খাটে শায়িতা মেয়েটিই আলোর লক্ষ্যস্থল কিনা তা সঠিক বলা না গেলেও বহুদিন চুণকামের অভাবে মলিন কক্ষের দেওয়ালগুলোর প্রতি যে তার কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না, তা একরকম জোর করেই বলা চলতে পারে। কক্ষটি মলিন হলেও শয্যাশায়িনী কিন্তু মোটেই মলিন নহে। শয্যা থেকেই শয্যাশায়িনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে।

খুব নীচু ধরণের ছোট্ট একখানি খাট। প্রস্থে তিন ফুটের বেশী না হলেও দৈর্ঘ্যে নিশ্চয়ই ছ'ফুট হবে। সেই ছ'ফুট পরিপাটি শয্যাখানি যেন সুঠাম শ্রী-অঙ্গ ধারণ করে ধন্য হয়েছে।

জানলার দিক থেকেই প্রবেশ করা যাক। সযত্নরচিত কুন্তল আলুলায়িত হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু চূর্ণকুন্তল

খাট ছাড়িয়ে এসে মেঝে স্পর্শ করেছে। শুভ্র কপালের নীচেই ঘন কৃষ্ণ পক্ষ্মদ্বয় ; ঈষতুন্নত নাসিকা, পরিপুষ্ট গণ্ডদেশ, পাতলা ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত, ভঙ্গীতে কৌতুকের হাসি ফুটে বেরোচ্ছে। আরও নীচে গেলেই দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যাবে কারণ পাতলা চাদরে আবক্ষ আবৃত।

হঠাৎ ধড়মড় করে শয্যাশায়িনী শয্যা ত্যাগ করল। সমস্ত.ঘরে আলোর কম্পন।

খাটের ধারেই ছোট্ট একখানা টিপয়। এক গ্লাস জল, উপরে কারুকার্য্যখচিত কাচের ঢাকনা ; পাশে একখানা বই। বইটির উপরে রয়েছে ছোট্ট একটি সুদৃশ্য হাত-ঘড়ি। তাড়াতাড়ি সে হাতঘড়িটি তুলে নিয়ে সময় দেখতে লাগল। কিছু পূর্ব্বে মুখে যে উদ্বেগ দেখা গিয়েছিল তা দূর হয়ে স্বস্তির আভা ফুঠে উঠল। মনে মনে বলল, "ওঃ মোটে ছ'টা।" গুন গুন করে গান ধরে সে সমস্ত ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। একপাশে খাট ; পায়ের দিকে দরজা। পরেই আলনা এবং তাতে সযত্নে কয়েকখানি শাড়ী পাট করে রাখা হয়েছে। অন্যান্য অঙ্গবাসও বেশ যত্নে গোছান আছে। আলনার নীচের তাকে অন্ততঃ পাঁচজোড়া বিভিন্ন ফ্যাসনের জুতো। তার হাতখানেক দূরেই কোণের দিকে একটা গোলটুলের উপর কাচের একটি কুঁজো। তার মুখেও সুদৃশ্য আচ্ছাদনী। খাটের ঠিক অপর পার্শ্বে বইয়ের

একখানি র‍্যাক। র‍্যাকের মাথায় রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মৃন্ময় মূর্ত্তি। খাটের মাথার দিকে জানলা। বিপরীত দিকেও জানলা। জানলার ঠিক নীচেই একখানা আরাম কেদারা, পার্শ্বে টেবিল ও চেয়ার। সেখানে বসলেই একটা শেফালিকা গাছে গিয়ে চোখ আটকায়। পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন ঘর। সর্ব্বত্র সুরুচির পরিচয়। আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে উপরের দিকে নজর পড়ল। অনেকদিন চুণকাম হচ্ছে না, খালি ঝাঁটা দিয়ে আর কত পরিষ্কার রাখা যায়। বাড়িওয়ালা তো একেই মহাপুরুষ তায় চারমাসের ভাড়া বাকী। তাই সহ্য করতেই হবে। শয্যাত্যাগ করেই সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। টানা খুলে একখানা চিঠি বের করল। টাইপ করা একখানা চিঠি। না ঠিকই আছে আজই ১৮ই মার্চ্চ। বেলা দশটায় যেতে হবে। ঢের সময় আছে এখনও। হবে তো? আয়নাটা হাতে করে একবার ভাল করে মুখখানা সে দেখে নিল। মুখ চোখ কৌতুকে ফেটে পড়ল। না হ'য়ে যায় কোথায়?

এমন সময় ক্ষীণ রুগ্ন কণ্ঠের আহ্বান এলো, "সুমিত্রা।"

"যাই বাবা।" ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে সে গেল। এক পাশে একখানা তক্তাপোষ। নীচে ঢালা বিছানা। তক্তাপোষের উপর পঙ্গু এক বৃদ্ধ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন। মুখে তাঁর বেদনা ও বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

"চা হলো ?"

"এই তো হচ্ছে বাবা।" তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে মেঝের বিছানার দিকে সুমিত্রার নজর পড়ল। তিনটি কিশোর-বয়স্ক ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একটি ভাই, দু'টি বোন। ভাইটি এইবারে ম্যাট্রিক দেবে। বোন দু'টি নেহাতই শিশু। সুমিত্রা একবার ভাবল ভাইটাকে ডেকে দেয়। উঠে পড়ুক। আবার ভাবল থাক্। উঠেই তো চায়ের জন্ম চেঁচাতে সুরু করবে। তাড়াতাড়ি সে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। একটা ঠিকে ঝি ছিল। তিন মাসের মাইনে বাকী পড়তে সেও চলে গেছে। সুমিত্রা নিজেই ছাই ফেলল, ঘর পরিষ্কার করল এবং উনানে আগুন দিয়ে হাতমুখ ধুতে গেল।

অল্পক্ষণ বাদেই কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেল।

"দিদি, চা," চোখ মুছতে মুছতে তিন ভাইবোন এগিয়ে এলো।

"হচ্ছেরে বাবা! হাতমুখটা ধুয়ে আয় না। আচ্ছা, দাঁড়া। পলাশ, যাতো বাবাকে চা'টা দিয়ে আয়।"

চায়ের পর্ব্ব শেষ হলো।

"দিদি বাজার যেতে হবে না ? তুমি তো আজ আবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির বেরোবে।"

"তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, তুই পড়তে বোস্ গিয়ে।"

"আচ্ছা বেশ, একবার পড়তে বসলে আমি কিন্তু উঠতে পারব না।"

"তোকে উঠতে হবে না, যা পালা।"

কিন্তু পড়ার দিকে পলাশের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। সে দিদির গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল এবং একসময় ঝট করে গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, "দিদি এবার চাকরী হলে আমাকে কিন্তু একটা ফাউন্টেন পেন কিনে দিতে হবে।"

ছোট বোন দু টিও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও তাদের দাবীর ফর্দ্দ পেশ করল। পরম স্নেহভরে তিন ভাইবোনকেই সুমিত্রা দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিল। আহা! মা নেই, দাদা নেই, বাবা থেকেও নেই কার কাছে এরা আব্দার জানাবে। চার মাস ধরে তার চাকরী নেই। সঞ্চিত যা কিছু ছিল নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারিদিকে প্রচুর ধার জমে উঠেছে। সকলের তাগাদা তবু সহ্য করা যাচ্ছে কিন্তু বাড়িওয়ালার ইতরামী আর সহ্য করা যায় না। অন্যেরা তবু দিনান্তে বা দু'দিন পর পর এসে তাগাদা দেয়। বাড়িওয়ালার সঙ্গে এক বাড়িতেই থাকতে হয় তাই অষ্টপ্রহর তার তাগাদা শুনতে হচ্ছে। তার উপর এই বাকী ভাড়ার সুযোগ নিয়ে বাড়ি-ওয়ালার গুণধর পুত্রটি সম্প্রতি যা' উৎসাহ প্রকাশ করছে তা' একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠছে। চাকরীটা এবার পেতেই হবে।

ক্ষীণকণ্ঠে বাবা আবার ডাকলেন। সুমিত্রা পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

"আজ ক'টার সময় তোর ইণ্টারভিউ?"

"দশটা।"

"অফিসটা কোথায়?"

"ডালহৌসী স্কোয়ার।"

"তা' যেতে তো প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে। একটু সকাল সকাল বেরিয়ে যাস্। আর দেখিস্ মা, বুঝিস তো সংসারের যা অবস্থা, এবার যেন কথা কাটাকাটি করে চান্সটা নষ্ট করিসনে। কি আর বলব তোকে, বাপ হয়ে......" অনুকূলবাবুর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো।

সস্নেহে বাবার চোখের জল মুছাতে মুছাতে সুমিত্রা বলল, "তুমি ভেবোনা বাবা, এবার চাকরী আমার নিশ্চয়ই হবে।"

"দিদি উনান ধরে যাচ্ছে রান্না চড়াবে না।"

"যাচ্ছি।"

ডালটা চড়িয়ে দিয়ে সুমিত্রা উনানের পাশে একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসল। অদূরে শিউলি গাছের ডালে একটা কাক বসে আছে। ঘাড়টা বারেবারে নেড়ে নেড়ে কাকটা যেন সুমিত্রাকে কি বলছে। বোধহয় বলছে, "ওগো মেয়ে, আমার মত ধূর্ত্ত হও। সারল্য, অকপটতা, সচ্চরিত্রের কপালে কোন দিন সুখ জোটে না। দুঃখ তাদের সঙ্গ

কখনও ছাড়তে চায় না। পারবে কি তাকে চিরদিনের মত বরণ করে নিতে ?……"

তা সুমিত্রা হয়তো পারে। কিন্তু পঙ্গু পিতা, অসহায় তিনটি ভাইবোন এদের কষ্ট আর সহ্য হয় না।

না, এবার থেকে ধূর্ত্তই হতে হবে। না হয়ে লাভ কি ? হঠাৎ স্মৃতির পটখানা সুমিত্রার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কত কথা এক সঙ্গে তার মনে ভীড় করে আসতে লাগল। পিতা কেরাণীই ছিলেন। কিন্তু যা রোজগার করতেন তা'তে সুখে না হোক্ শান্তিতে সংসার চলে যেত। প্রথম সন্তান সুমিত্রা। পিতার সমস্ত স্নেহ অজস্রধারে তার প্রতিই উৎসারিত হয়েছিল। ফুটফুটে ছোট্ট খুকী, একরাশ কালো চুল মাথায়, দুষ্টুমি ভরা দুটি চোখ, বাপ মায়ের নয়নের মণি ! একটি লালফ্রক পরে যখন সে মায়ের সঙ্গে প্রতিবেশীদের গৃহে অথবা বাবার সঙ্গে রাস্তায় বেরুত তখন সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখত।

অফিস থেকে বাবার ফিরতে প্রায় ছ'টা হয়ে যেত। ছোট্ট খুকীটি পাঁচটা থেকেই ঠায় জানলার ধারে বসে থাকত। ওঃ ! অন্ধকার হয়ে গেল। ঐ তো মোড়ে লজেন্সের দোকানটায় আলো জ্বলে উঠেছে। নাঃ, বাবাকে আজ আচ্ছা করে বকে দিতে হবে !

"সুমি, একবার এদিকে আয় তো।" মায়ের কণ্ঠস্বর।

"না, এখন আসতে পারব না।"

"আরে বাব্বা। আয়-ই না বাপু একটু এদিকে। তোর বাবাকে আর কেউ আটকে রেখে দেবে না! এমন বাপ সোহাগী মেয়ে আর দেখিনি!"

একটু পরেই বাবা এলেন। দু'হাতে, পকেটে প্রচুর বকশিশ। জামাকাপড় না ছেড়েই কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাবার কত কথা কাটাকাটি। মা এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না।

"আহা, জামাকাপড়টা ছেড়ে একটু জিরোও না। এই পাজী মেয়ে যা' এখান থেকে এখন।" মা রীতিমত রাগ করতেন। অভিমানে সুমিত্রার দু'চোখে জল ভরে আসত। ঠোঁট দু'খানি বেঁকে গেছে এবার আওয়াজ বেরোবে। তার আগেই বাবা আবার তাকে বুকে টেনে নিতেন। মাকে ধমকের সুরে বলতেন, "খবরদার বলছি, আমার মাকে তুমি কিছু বলতে পারবে না। হ্যাঁ, মা-মণি আমি অফিসে গেলে তোমার মা বুঝি সারাদিন তোমাকে বকে?"

মাথা নেড়ে সুমিত্রা বলত, "হুঁ।"

"এই মিথ্যুক মেয়ে, কখন তোকে আমি বকি রে! আচ্ছা বেশ আমাকে যখন এতই অবিশ্বাস তখন কাল থেকে মেয়েকে সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে যেও।"

"তাই নিয়ে যাব।"

"হ্যাঁ, তাই যেও। এই মেয়েই বড় হয়ে তোমাকে অফিস করে খাওয়াবে কি না?"

হায়রে কত বড় একটা মর্ম্মান্তিক সত্য মায়ের মুখ দিয়ে সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর স্কুল ও কলেজ জীবন। ছোট ভাইবোনদের আগমন। হাসি কান্নায় ভরা সুখের দিনগুলি। কলেজ জীবনে অনেক বন্ধু জুটতে চেয়েছিল। সুমিত্রার অসামান্য রূপ শুধু ছাত্রদের নয় অনেক অধ্যাপকেরও রক্তে স্পন্দন লাগাত। দীর্ঘাঙ্গী, সুঠাম মেয়েটি যখন সাবলীল ভঙ্গীতে কলেজে গিয়ে ঢুকত তখন বহু তির্য্যক দৃষ্টি এসে তাকে বিদ্ধ করত।

সুমিত্রা তার রূপ সম্পর্কে বরাবরই সচেতন ছিল। কিন্তু রূপ নিয়ে আগুন আগুন খেলার তার কোন দিনই প্রবৃত্তি হত না। কলেজের কমনরুমে সঙ্গিনীরা যখন কাকে কাকে ঘায়েল করেছে তার ফিরিস্তি দাখিল করত তখন সুমিত্রা লজ্জা পেত। সঙ্গিনীরা এই নিয়ে কত ঠাট্টাই না করত। তারা বলত, "তা ভাই, সুমিত্রার বোধহয় ছাত্র অথবা যুবক অধ্যাপকের দিকে মন নেই। না ভাই, সুমিত্রা?" আরেক জন ফোড়ন কাটত, "তবে কার দিকে!"

"বোধহয় বুড়ো প্রিন্সিপ্যালকে ঘায়েল করবার জন্যেই সে চুপচাপ আছে।" কমনরুমে হাসির রোল উঠত। সেই দিনগুলোও না কত সুখের ছিল।

কলেজ জীবনে একজনের কথা সুমিত্রার এখনও মনে পড়ে। মোটর হাঁকিয়ে আসা কত ছাত্র, বিদ্যায় বুদ্ধিতে

সমুজ্জ্বল কত অধ্যাপক, সবার কথাই সুমিত্রা ভুলে গিয়েছে। লজিকের অধ্যাপক অমিয়বাবু, ইতিহাসের কিরণবাবু, ইকনমিক্সের···কি জানি নামটা মনে নেই—এঁদের কথা মনে হ'লে সুমিত্রার এখনও হাসি পায়। গায়ে পড়ে সাজেশান্ দেওয়া, ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ষ্টাফ রুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে হিতোপদেশ, বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নম্বর বলে দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতার নম্বর যোগ দিতে সাহায্য করতে বলা, মাঝে মাঝে বাড়িতে হাজির হয়ে কি রকম পড়াশোনা হচ্ছে তার খবর নেওয়া—আরও কত কি! মনে পড়লে সুমিত্রার এখনও কৌতুক লাগে। সবই সুমিত্রা বুঝতে পারত। কি হ্যাংলামী, ছিঃ!

শুধু একজনের কথা সুমিত্রার এখনও মনে পড়ে। সে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়। অধ্যাপক নয়, ছাত্রও নয়, সামান্য এক কলেজের কেরাণী। নেহাতই পদমর্য্যাদাবিহীন ব্যক্তি। পার্সেণ্টেজের খাতা ঠিক রাখা ও ফী বুক ভর্ত্তি করা—এই ছিল তার কাজ। মাসে একবার করে তার কাছে যেতে হত। ছেলেমানুষ তায় অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। সুমিত্রার মুখের দিকে পর্য্যন্ত সে তাকাত না। অন্যদের কাছে গেলে দশ মিনিট বসিয়ে দু'চার দশটা কথা না বলিয়ে তারা সুমিত্রাকে ছাড়ত না। কিন্তু ও কোন কথাই বলত না। টেবিলে একটা বই খোলা থাকত। সুমিত্রা লক্ষ্য করত কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে সর্ব্বদাই বই পড়ছে। সুমিত্রা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ফী

বুকটা তার হাতে দিয়ে দিত। এক মিনিটও লাগত না। খাতাখানা দিয়েই বইয়ে অথবা কাজে মন দিত। একবার সুমিত্রা ফী বুক আনতে গিয়েছে। কাছে দাঁড়াতেই মোহিত ত্রস্ত হয়ে উঠল। অত্যন্ত কাঁচুমাচু ভঙ্গীতে বলল "মাপ করবেন, মিস্ দত্ত। এখনও টুকে উঠতে পারি নি। সোমবার নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।"

ভীত ত্রস্ত ভঙ্গীটি সুমিত্রার মনে কৌতুকের সৃষ্টি করল। একটু দুষ্টুমী করবার ইচ্ছে সে সামলাতে পারল না। বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, "পারবেন আর কোত্থেকে? সারাদিন তো শুধু বইই পড়ছেন। অফিসের কাজে একদম ফাঁকি। আমি যাচ্ছি প্রিন্সিপ্যালকে বলতে।"

আতঙ্কে মোহিতের মুখ কালো হয়ে গেল। আত্মগ্লানির সুরে বলল, "আচ্ছা একটু দাঁড়ান, এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি।" বলে হাতের বইটা ড্রয়ারে রাখতে গেল।

সুমিত্রার কেমন মায়া হল।

"কি বই পড়ছিলেন?"

মোহিত উৎসাহিত হয়ে উঠল, "ওঃ! কি বলব আপনাকে, ভারী চমৎকার বই! বার্ণার্ড শ'য়ের জীবনী—হ্যারিসের লেখা, একেবারে উপন্যাসের মত। আপনি পড়েছেন?"

"কই না তো। বইয়ের নাম পর্য্যন্ত শুনিনি।"

"তা হলে আজকেই পড়ে ফেলুন। সত্যি বলছি খুব চমৎকার বই।"

"কোথায় পাব? লাইব্রেরীর বই তো আপনি এনে দখল করেছেন।"

"আমার হয়ে গেছে। এই নিন, আপনি নিয়ে যান।" উৎসাহের আতিশয্যে সে সুমিত্রার হাতে বইখানা তুলে দিল।

"আচ্ছা, পড়ে দেখব।" সুমিত্রা চলে যাচ্ছিল।

"এই যে মিস্ দত্ত, ফী-বুকটা নিয়ে গেলেন না?"

"আচ্ছা, আজকে থাক, সোমবার দিনই লিখে রাখবেন।"

কয়েক দিন পরে। সোমবারে সুমিত্রা ফী বুক আনতে যায় নি। হ্যারিস লিখিত বার্ণার্ড শ'য়ের জীবনী সে পড়ছিল। সত্যিই চমৎকার বই, উপন্যাসের চেয়েও মনোরম। বর্ত্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ককে যেন এক্সরে করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই জীবনী পড়ে শ'য়ের উপর সুমিত্রার কেমন অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। বার্ণার্ড শ' চরিত্রহীন!

বাবাও বইখানা পড়ছিলেন। তিনিও বইখানার প্রশংসা করছিলেন। কন্যাকে তিনি জিজ্ঞেসা করেছিলেন "হ্যাঁরে! এই বইয়ের কথা তোকে কে বলল?"

সুমিত্রা বই প্রাপ্তির ইতিহাস বর্ণনা করল।

"তাই নাকি! আচ্ছা ওঁকে জিজ্ঞেসা করে দেখিস তো শ'য়ের আরও কোন জীবনী আছে কি না?"

"আচ্ছা। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খবর রাখেন, সারাদিন শুধু পড়ে।"

বই নিয়ে সুমিত্রা মোহিতের কাছে গেল। মোহিত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেসা করল, "কই সোমবারে আসেন নি তো? বইটা পড়েছেন? ভাল লাগে নি?"

"পড়েছি।"

"কেমন লাগল?"

"বিচ্ছিরি।" ঠোঁট উল্টে সুমিত্রা বলল।

"সে কি! তা' হলে আপনি বুঝতে পারেন নি?" সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে সে যেন কি বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে সুমিত্রা বলে উঠল, "বুঝতে পারব না যখন বুঝেছিলেন, তখন এত খাতির করে দিয়েছিলেন কেন?"

"না, না, মাপ করবেন। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এত ভাল বই আপনার ভাল লাগল না কিনা তাই ..."

"ভাল বই না ছাই। বার্ণার্ড শ' যে এমন খারাপ লোক তাতো জানতাম না।"

"খারাপ হতে যাবে কেন? তার আইডিয়াস্..."

"রেখে দিন আইডিয়াস্। একেবারে বেহায়া। না হয় নিজের কথা এমন করে কেউ কারো কাছে বলতে পারে? আচ্ছা, যাক্। শ'য়ের আর কোন জীবনী আছে? বাবা চেয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, আছে বই কি? আপনার বাবা বুঝি এটা পড়েছেন?"

"হ্যাঁ। আরও কোন জীবনী আছে কি না জানতে চেয়েছিলেন।"

"আছে। আমি আজই খুঁজে রেখে দেব। কাল নিয়ে যাবেন।"

"কাল আমার ক্লাস নেই। আসব না।"

"তা' হলে পরশু।"

"পরশু থেকে তো আই, এ পরীক্ষা আরম্ভ হবে, আমাদের কলেজ ছুটি থাকবে।"

"ও তাই তো, তা' হলে তো অনেক দিন দেরী হয়ে যাবে।" মোহিতের স্বরে হতাশা।

"আচ্ছা, কাল না হয় আমি এসে নিয়ে যাব। আর যদি আসতে না পারি..."

"আপনারা থাকেন কোথায়?"

"বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট।"

"আমি তো গড়পাড় থাকি। কাল না হয় যাবার পথে আমি দিয়ে যাব।"

"তা' হলে তো বেশ ভালই হয়। ঠিক ছ'টার সময় যাবেন। বাবা তখন বাড়িতে থাকবেন।"

পরদিন ছ'টার সময় মোহিত বই নিয়ে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়। সুমিত্রা মাঝে মাঝে কথা যোগান দিচ্ছিল। বাবা সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, মোহিতও সাহিত্যরসিক, তাই আলাপ খুব জমেছিল। রাত প্রায় নটার সময় মোহিত বিদায় নেয়। বাবা তাকে সময় পেলেই আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলেন।

মোহিত চলে যাবার পর বাবা বলেছিলেন, "ছেলেটি খুব পণ্ডিত। যথেষ্ট পড়াশুনা করেছে। আর খুব বিনয়ী ও ভদ্র।"

"তা হলে ভাল চাকরী পাচ্ছে না কেন?" হঠাৎ সুমিত্রার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল।

"দেখ পাগলী মেয়ের কথা। ভাল ছেলে হলেই ভাল চাকরী পাবে এমন কথা কি লেখা আছে নাকি? গরীবের ছেলে, কোথায় ভাল চাকরী পাবে?"

"চেষ্টাও বোধহয় করে না। সারাদিন তো দেখি ঘাড় গুঁজে বই পড়ে।" কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সুরে সুমিত্রা বলল।

"চেষ্টা করলেই কি আর ভাল চাকরী জোটেরে। মুরুব্বীর জোর চাই।"

ঢালা আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও মোহিত যখন তখন আসত না। সুমিত্রা বললে পরে সে আসত। তাও একবার দু'বার বলাতে আসত না। সুমিত্রা রাগ করে বলত, "দর বাড়াচ্ছেন, না?"

"না, না, ছিঃ! সত্যিই আপনার বাবার সঙ্গে গল্প করে আমি খুব আনন্দ পাই। কিন্তু..."

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সুমিত্রা বলত, "ওঃ! আর কারও সঙ্গে গল্প করতে বুঝি দুঃখ হয়। বাবাও দেখি আপনার কথাই বলেন। তা' তাঁকে বলছি তিনিই যেন এসে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন।"

"এই দেখ, আমি কি তাই বলছি। অফিস ছাড়াও অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকতে হয় যে। রেশন, বাজার, ডাক্তার টিউশানী কত যে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় তা' আপনাকে আর কি বলব ? বললেই বা বুঝবেন কি করে ? সুখে আছেন তো ?"

"থাক্ না। এত ফিরিস্তি আমি শুনতে চাইনে। আজ বিকেলে যাচ্ছেন তো ?"

"আজ ? আচ্ছা, কাল বিকেলে যাব ?"

"বেশ, তা'হলে আর যেতে হবে না।" অভিমানে ফেটে প'ড়ে সুমিত্রা চলে যাচ্ছিল।

মোহিত তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সামনে দাঁড়াল, "মাপ চাইছি। আজই যাব।"

"আপনার দয়া। আমি কিছু বলতে চাইনে।" সুমিত্রা চলে গেলে পেছন থেকে মোহিত বলে উঠল, "ঠিক ছটা।"

এই হৃদ্যতা ও অকপটতার সুযোগ নিয়ে মোহিত কোন দিন স্নেহের গণ্ডী অতিক্রম করে নি। বাড়ির ছেলের মত আসত, বসত, গল্প করত। সত্যি এত ভদ্র যুবক সুমিত্রা আর দেখে নি! তাই তার কথা ভুলতে পারে না।

কোথায় আছে মোহিত এখন ? কলকাতার কেরাণীগিরি যখন আর পোষাল না তখন আসানসোলে এক কলিয়ারীতে চাকরী নিয়ে চলে গিয়েছিল। প্রায়ই চিঠিপত্র লিখত, কলকাতায় এলে দেখা করত। বছর দেড়েক আসানসোলে

ছিল। তারপর যে কোথায় গেল আর খবর নেই। সে আজ পাঁচ বছরের কথা।

ইতিমধ্যে সুমিত্রাদেরও অবস্থা বিপর্য্যয় দেখা দিল। বাবা কঠিন টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে গেলেন। সুদীর্ঘ ছয়মাস ধরে একটানা রোগে ভোগার ফলে সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে গেল। সঞ্চিত অর্থ প্রায় বিশেষ কিছুই ছিল না, যা ছিল গেল। মায়ের গহনা গেল, অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটাও গেল, শেষে চাকরীও গেল।

সুমিত্রা তখন সবে বি, এ, পাশ করেছে। সংসারের বোঝা তাকেই ঘাড়ে করতে হল। মায়ের জন্য যত না হোক বাবার জন্যে সে যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। সদাহাস্যময় তার বাবার আজ একি অবস্থা! অসহায়ের মত শুধু তাকিয়ে থাকেন। সুমিত্রার দিকে চোখ পড়তেই তাঁর দু'চোখ জলে ভরে আসে। সুমিত্রার চোখও শুষ্ক থাকে না। এমনি এক বিপর্য্যয়ের দিনে সুমিত্রা মাকেও হারাল। তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। চাকরীর বাজার ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকলেও একেবারে দরজা বন্ধ হয়ে যায় নি। শিক্ষয়িত্রীর কাজ অহরহই পাওয়া যাচ্ছিল। প্রায় নিজের চেষ্টাতেই সুমিত্রা একটা মাষ্টারী জুটিয়ে নিল। মাষ্টারীটাই তার কাছে খুব প্রশস্ত বলে মনে হল। অফিসে গিয়ে পুরুষদের সঙ্গে বসে কাজ

করার কথা ভাবতেই তার ভয় হত। "স্কুলে যাব, আসব, মন দিয়ে পড়াব, কারো তোয়াক্কা রাখব না" এই ছিল মনের ভাব। মাইনে অবশ্য খুব বেশী নয় তবে সম্মানটা তো বজায় থাকবে। মাষ্টারী করলে দুয়েকটা ভাল টিউশানীও পাওয়া যাবে হয়তো। যে করে হোক্ দুঃখেকষ্টে চলে যাবে।

কিন্তু মোহ ভাঙ্গতে খুব বেশী সময় লাগল না। একে তো স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষয়িত্রী থাকায় প্রচুর খাটতে হয়, সেই অনুপাতে আবার পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না। তারপর যাদেরকে মন দিয়ে পড়াবে বলে সুমিত্রা বহু আশা নিয়ে গিয়েছিল দেখল একমাত্র লেখাপড়া ছাড়া অন্য সব ব্যাপারেই তাদের উৎসাহ ও মনোযোগ অপরিসীম। ফ্রক্ ছেড়ে যারা শাড়ী ধরেছে তাদের তো কথাই নেই ফ্রক্ পরিহিতাদের মধ্যেও অনেকেই বায়োস্কোপ এবং অমুকদা তমুকদার সঙ্গে অভিযানের কাহিনী বলতে ভালবাসে। দু'চারজন যে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহশীল নয় এমন নহে তবে তাদের সংখ্যা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মতই। ফলে সুমিত্রার উৎসাহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলো। ভগ্নস্বাস্থ্য এবং বিগতযৌবনা সহ-শিক্ষয়িত্রীদের কাছ থেকেও খুব বেশী প্রেরণা সে পেল না। দু'চারজন তো তাকে স্পষ্ট বললেন, "কেন ভাই মরতে এ লাইনে এসেছ। তোমার বয়স কম, চেহারাটিও বেশ ভালই আছে, এই

বেলা কারুকে নিয়ে ঝুলে পড়। এখনও বন্ধু জুটবার বয়স আছে, পরে কিন্তু কেউ ফিরেও তাকাবে না, মিথ্যে আপশোষ করে মরবে।”

সুমিত্রার এখনও মনে আছে, সে বলেছিল, “রূপ আর স্বাস্থ্যই বুঝি সব। গুণের বুঝি কোনই দাম নেই।” হো হো করে অলকাদি হেসে ফেলেছিলেন। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, “এ মেয়ে দেখছি এখনও সত্যযুগে বাস করছে। তোমার গুণ কে দেখতে আসছে ভাই? রূপ দেখেই তো প্রথম আসবে এবং পুড়ে যদি মরে না যায় তবেই না গুণের সন্ধান পাবে। পড়নি ‘তবে কেন প্রেম দিলে রূপ যদি নাহি দিলে বিধিরে।’ অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নাও ভাই পরে পস্তাবে।”

“তা হলে আমি বিয়েই করব না। উপার্জ্জন করব, নিজের মত থাকব, বই পড়ব, কারুর ধার ধারব না।”

অলকাদি সজোরে আরেক দফা হাসি হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন, “ইস্ ভারী যে তেজ দেখছি। বয়সটা বোধহয় এখনও কুড়ি পেরোয় নি। বুঝবে ভাই বুঝবে, কারুর ধার না ধেরে যে সংসারে থাকা যায় না এবং তাতে যে শান্তিও পাওয়া যায় না তা’ শীগগিরই বুঝবে।”

সত্যিই সুমিত্রা আজ তা’ বুঝতে আরম্ভ করেছে। স্কুলের চাকরীকে সে যতটা নিরীহ ভেবেছিল কার্য্যকালে দেখা গেল যে মোটেই তা নয়। বরং আজ মনে হচ্ছে

মাষ্টারীই সবচেয়ে জঘন্য কাজ। অন্যান্য চাকরীতে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় খুবই সুস্পষ্ট। সওদাগরী অথবা সরকারী কাজে আদর্শবাদের কোন বালাই নেই। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতক্গুলো নির্দ্দিষ্ট কাজ করে দিতে হবে। বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে তাতে হয়ত চলে না। কিন্তু ঐ সময়টুকুর বাইরে স্বাধীন থাকা চলে। উন্নতির আশা না করলে আত্ম-সম্মান বজায় রাখাও চলে। কিন্তু মাষ্টারীতে তা' হবার উপায় নেই। শুধু চাকরীটা বজায় রাখতেই হেডমিষ্ট্রেস থেকে আরম্ভ করে সেক্রেটারী পর্য্যন্ত সকলকে নানাভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। যারা নূতন নূতন এই লাইনে ঢোকে তারা ভূয়া সম্মান ও ফাঁকা আদর্শবাদের বুলিতে কিছুদিন আচ্ছন্ন থাকে কিন্তু ফাঁকিটা ধরা পড়তে বেশী দিন লাগে না। সুমিত্রা দেখেছে যে বেশীর ভাগ স্কুলই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাত্র। ছেলেদের স্কুলগুলো তবু শুধু অর্থ আমদানির প্রতিষ্ঠানরূপে চালিত হয়ে থাকে কিন্তু মেয়েদের স্কুলগুলোর পেছনে যে সব মহাপুরুষ থাকেন তাদের উদ্দেশ্য আরও মহৎ। 'জাতি গঠনের মহান কর্ত্তব্য পালন করছি' সুমিত্রার প্রথম প্রথম এরূপ একটা অভিমান ছিল। দক্ষিণার স্বল্পতা তাকে খুব বেশী পীড়া দিত না। কিন্তু সেক্রেটারী মহোদয় যখন অযাচিত দয়া প্রদর্শন করতে লাগলেন এবং তা' নিয়ে সহকর্ম্মিণী এমন কি উঁচু ক্লাসের ছাত্রীদের মধ্যেও কানাঘুঁষা চলতে লাগল তখন চাকরী করা আর সম্ভব হলো না। অর্থও নেই অথচ

অযাচিতভাবে অনর্থ এসে দেখা দেবে এই দ্বন্দ্বে সে আর থাকতে পারল না।

তারপরে আরও দু'তিন জায়গায় সুমিত্রার চাকরীর অভিজ্ঞতা হয়েছে। সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। সুমিত্রা আজ বুঝতে আরম্ভ করেছে মেয়েরা কত অসহায়। অফিসে তো বটেই রাস্তায় ঘাটে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেন জানোয়ারের দল ওৎ পেতে আছে। ষাট বছরের বুড়ো থেকে চৌদ্দ বছরের স্কুলের ছোঁড়াটা পর্য্যন্ত রাস্তায় একটা মেয়ে দেখলে হা করে থাকে। ট্রামে, বাসে একটুখানি গা ঠেকিয়ে দেবার জন্যে সে কি ইতরজনোচিত নির্ল্লজ্জ প্রয়াস। সহস্র চক্ষুর অবিরত লেহন এবং কুৎসিত ইঙ্গিত অহরহ সহ্য করতে হয়। সুমিত্রা জানে এ শুধু তার একার অভিজ্ঞতা নয়, প্রত্যেকটি মেয়েরই এই অভিজ্ঞতা। একা একা বাড়ী থেকে বেরোবার এবং ফিরবার সময় কতজন যে পিছু নেয় তার ইয়ত্তা নেই।

অথচ কলকাতার নাগরিক বলে এদের কতই না অহঙ্কার। আত্মসম্মানজ্ঞান সুমিত্রার খুবই তীব্র ছিল। তাই কোথায়ও চাকরী রাখা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। শেষবার তো একটা দারুণ কেলেঙ্কারী করে সে চাকরী ছেড়েছে। দয়াভাই কিষেণ চাঁদ এণ্ড কোম্পানী বিরাট বস্ত্র ব্যবসায়ী, সে অফিসে বেশ ভাল মাইনেতে সুমিত্রা চাকরী পেয়েছিল। প্রায় বছর খানেক বেশ ভাল ভাবেই কেটেছিল। একটানা এত দীর্ঘদিন চাকরী কোথায়ও তার থাকে নি। তারই ফলে

জিনিষপত্র কিছু কিছু সে করেছিল এবং কিছু টাকাও জমিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যে তা সইল না। একদিন হঠাৎ মালিকের ছোট পুত্র অফিসের একঘর লোকের সামনে ঢুলু ঢুলু নেত্রে গদগদ ভাষায় সুমিত্রার রূপের ও পোষাক পরিচ্ছদের প্রশংসা আরম্ভ করে দিল। প্রথমটায় মৃদু আপত্তি এবং পরে চপেটাঘাতে মাড়োয়ারী নন্দনের নেশা কাটে। বলা বাহুল্য, চাকরীটিও সেই দিনই যায়।

তারপর প্রায় চার মাস হয়ে গেল। আর চাকরী পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক ভেবে সুমিত্রা দেখল যে ভদ্র ভাবে চাকরী করা এই দেশে মেয়েদের পক্ষে এখনও সম্ভব নয়। অথচ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনই যে চাকরী না করেও উপায় নেই। তাই সুমিত্রা ঠিক করেছে বাঁকা পথই সে ধরবে। চাকুরে মেয়েদের তো এমনিতেই নিন্দার সীমা নেই, না হয় আরেকটু হবে। আজকের ইণ্টারভিউ ব্যর্থ হতে সে দেবে না। চাকরী তার চাই।

ভোরের আলো কলকাতার আর একটি বাড়িকেও স্পর্শ করেছে। অজয় বরাবরই একটু দেরীতে ঘুম থেকে উঠে। আটটার আগে প্রায়ই নয়। পড়াশুনায় বাতিক তার বরাবরই খুব বেশী। ইদানীং সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত নানা ধান্ধায় ঘুরতে হয় বলে পড়াশুনার প্রায় সময়ই সে পায় না। তাই রাত্রেই খানিকটা অভ্যাস বজায় রাখা গোছের পড়াশুনা সে করে। তাতেই রাত্রি একটা দেড়টা বেজে যায় ফলে সকালে ঘুম থেকে উঠা তার আর হয়ে উঠে না।

আজ অফিসে চাকুরী প্রার্থিনীদের আসার কথা। দশটা থেকে ইণ্টারভিউ আরম্ভ হবে তাই সাহেব তাকে নটার মধ্যেই যেতে বলে দিয়েছেন। কাল অফিস থেকে ফিরেই মাকে খুব ভোরবেলা তাকে ডেকে দিতে সে বলে রেখেছিল।

মা ছোট বোন রমাকে বলছিলেন, "যাতো, ছটা বেজে গিয়েছে, তোর দাদাকে ডেকে দে।"

“ওরে বাবা, আমি পারব না,” চোখ দুটি কপালে তুলে রমা বলল।

“কিচ্ছু বলবে না, আজ তাকে সকাল সকাল অফিস যেতে হবে।”

“তা হোক, তুমি ডাক গিয়ে।”

শেষ পর্য্যন্ত মা-ই ছেলেকে ডেকে তুললেন।

ঘুম থেকে উঠেই অজয় বাজারে বেরিয়ে গেল এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ সেরে দেখল সাতটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি দাড়ি কাটতে সে বসে গেল। জানলার ধারে বসে দাড়ি কাটতে কাটতে হঠাৎ অজয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

না জানি কি অদৃষ্টে আছে। দিনকাল যা পড়েছে তাতে চাকরী একবার গেলে আর পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য চাকরী যাওয়ার কোন কথা নেই। তথাপি কেন জানি তার কেবলি মনে হচ্ছে যে, আজ নূতন লোক নিযুক্ত হওয়ার পরই তার আর চাকরী থাকবে না। সে ষ্টেনো-গ্রাফার হয়ে ঢুকেছিল। এস্‌টাব্লিশমেণ্টের কাজ তার মোটেই জানা নেই। রোহিণীবাবুর সহকারী যিনি এস্‌টাব্লিশমেণ্টে আছেন তিনি অজয়ের এখানে আসাটাকে মোটেই পছন্দ করেন নি। তারপর সেদিন অফিসের ঐ সমস্ত আলোচনা এবং রোহিণীবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কারুকে না বলে অফিস থেকে বেরিয়ে আসা সবই সাহেব জানতে পেরেছেন এবং

তাতে যে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন তা' অজয় বুঝতে পেরেছে।

একবার মনে হয় ভয়টা কিসের? দুনিয়াতে তো শুধু মিত্র এণ্ড কোম্পানীই একমাত্র অফিস নয়। আরও যথেষ্ট অফিস আছে। সে লেখাপড়া শিখেছে, কাজ কর্ম্মেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। একটা না একটা জুটে যাবেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হয় অফিস মালিকদের একতার কথা। কোন্ অফিস থেকে কে বরখাস্ত হল কি করে জানি সবাই এই কথাটি জেনে ফেলেন এবং প্রাণান্তেও সেই লোককে আর কেউ নিতে চান না। এমনিতে মালিকদের মধ্যে স্বার্থের কড়ি নিয়ে যতই ঝগড়া থাকুক না কেন এই ব্যাপারে তাঁরা খুবই একতাবদ্ধ।

নিজের জন্য অবশ্য অজয় ভাবে না। স্বাস্থ্য আছে, বিদ্যাও কিছু কিছু আছে, ভূয়া আত্মসম্মানের বালাই নেই। যা হোক করে একটা পেট চলে যাবেই। কিন্তু ছোট দুটি বোন, একটা ভাই, বিধবা মা এদের কি গতি হবে? কয়েক বছর আগেও এদের জন্যে কোন চিন্তার কারণ ছিল না। দেশে কিছু জমি জায়গা এবং মাথা গুঁজবার মত একটা বাড়ি ছিল। খুব সুখে না হোক্ দু'টি খাওয়ার অন্ততঃ ভাবনা ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক জুয়াখেলার বলি হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে অজয়ের মা আর ভাইবোনকেও চলে আসতে হয়েছে। আগেও বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে অজয়ের যথেষ্ট

দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সে দায়িত্বের সঙ্গে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েই সে খালাস পেত। বছরে একবার বাড়ি যেত আর মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের মারফৎ কর্ত্তব্য সমাধা করত। তখন ছিল তার অফুরন্ত সময়। অফিসের সময়টুকু ছাড়া অফুরন্ত স্বাধীনতা ছিল তার। প্রচুর পড়াশুনা এবং ভ্রমণ এই ছিল অজয়ের একমাত্র নেশা। পড়াশুনায় ছিল বিচিত্র রুচি। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কিত প্রচুর গ্রন্থে ছিল অসাধারণ আগ্রহ। প্রতি মাসেই যথেষ্ট কষ্টো-পার্জ্জিত অর্থের অন্ততঃ কিছুটা দিয়ে সে বই কিনত।

আর ছিল তার ভ্রমণের অদ্ভূত নেশা। ছুটী পেলেই সে একদিকে না একদিকে বেরিয়ে পড়ত। তা' ছাড়া প্রতি রবিবারেই সে কলকাতার আশেপাশে কোন একটা জায়গায় চলে যেত। কলকাতা থেকে যত লোক্যাল ট্রেন এবং বাস মফঃস্বলে যায় তার কোনটাতেই তার যাওয়া বাদ নেই। কলকোলাহলময় নগরীর বাইরে গিয়ে সে যেন নিজেকে চিনতে পারত। শস্যশ্যামল মাঠ অথবা জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম অথবা ক্ষীণতোয়া নদী সব কিছুই যেন তার কাছে এক অপূর্ব্ব রহস্য নিয়ে ধরা দিত। গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ প্রকৃতির বক্ষ চিরে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে রেলগাড়ী যখন ছোট কোন ষ্টেশনে এসে হঠাৎ থেমে যায় তখন নিদ্রাকাতর আরোহীর মনের যে অবস্থা হয় কলকাতার বাইরে চলে

এলে অজয়ের মনেও ঠিক সেই রকম একটা প্রশান্তির ভাব আসে এবং তারই আকর্ষণে সে বারেবারে সুযোগ পেলেই বাইরে চলে আসত। কিন্তু আজ চার বছরের মধ্যে একদিনের তরেও সে সুযোগ তার হয় নি। ফলে এক অস্থির ভাব সর্ব্বদাই তাকে চঞ্চল করে রাখে। সারারাত্রি উৎসবের হট্টগোলে মত্ত হয়ে থাকলে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী যেমন আতপ্ত হয়ে উঠে অজয়েরও তাই হয়েছে। তার উপর আছে দৈনন্দিন জীবন যাপনের দুর্ব্বিষহ চিন্তা।

সকাল সন্ধ্যা টিউশনী, সারাদিন অফিস, হাট বাজার, রেশন, অসুখ বিসুখ—অষ্টপ্রহর একেবারে চক্রে আবদ্ধ। নিরাশায় ভরা বর্ত্তমান, ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ, শুধুই 'দিন যাপনের গ্লানি।' কি লাভ এই জীবনের? বোনদু'টির বিয়ে দিয়ে ছোট ভাইয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই সে সব কিছু ছেড়ে পালাবে।

"বা, দাড়ি কাটতে কাটতে হঠাৎ চুপ করে বসে আছ কেন?" রমা এসে বলল। "আটটা বেজে গেছে; আজ না সকাল সকাল যেতে হবে?"

"হ্যা, তাইতো। দেখ তো কলে কেউ আছে কিনা, আমি এক্ষুণি আসছি।"

"জান দাদা, কাল বড় মামা এসেছিলেন।"

"কেন রে?"

"তোমার বিয়ের কথা বলতে—"

"যা, যা, পালা," দাড়িতে শেষ টান দিয়ে অজয় উঠে পড়ল।

"না দাদা, তুমি আর অমত করো না। বড়মামার কথা শুনে মা কাঁদছিল।"

"কেন?"

"বড়মামা বললেন যে তোমার দিকে নাকি মা'র কোন লক্ষ্য নেই।"

"তার মানে?"

"তা' তোমার এত বয়স হলো, চাকরী করছ, সারাদিন খাটছ আর সব সংসারের গহ্বরে ঢেলে দিচ্ছ, তোমারও তো একটা আরাম বিরাম আছে।" অভিমানের সুরে রমা বলল।

"তা' তোরা বললি না কেন যে আমার জন্য তাঁর ভাবতে হবে না? তোরা এসব কথা শুনিস কেন?" অজয় মহাক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

"তা' রাগ করলে চলবে কেন? লোকে বলবে বৈ কি।"

"লোকের কি ধার ধারি, তারা কি আমাদেরকে খাওয়াচ্ছে?"

"লোকেরাই বা তোমার ধার ধারবে কেন? উচিত কথা বলবে না?"

"যাকগে তোমার সঙ্গে এখন উচিত অনুচিতের তর্ক করার আমার সময় নেই। যাও তো রান্না হয়েছে কিনা দেখো গিয়ে।" গামছা হাতে অজয় কলতলার দিকে ছুট দিল।

অজয় অফিসে এসে দেখে ইতিমধ্যেই কর্ম্মপ্রার্থিনীদের কেউ কেউ এসে হাজির হয়েছে। সবে মাত্র ন'টা বেজেছে। দশটায় ইণ্টারভিউ হবে। সবশুদ্ধ আঠারোজন প্রার্থিনীকে ডাকা হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে একজনকে নেওয়া হবে।

মিত্র সাহেব এখনও আসেন নি, তবে তাঁর চাপরাশীরা এসেছে। তারাই প্রার্থিনীদের অফিস ঘরে বসিয়েছে। অজয় এক পলকে দেখে নিল যে, দু'তিন জন ছাড়া সবাই ইণ্টার-ভিউয়ের জন্য এসে গেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সে দরখাস্তের ফাইলটা বার করল এবং যাদেরকে আজকে ডাকা হয়েছে তাদের দরখাস্তগুলো পর পর সাজিয়ে ফেলল। এখনও দশটা বাজতে প্রায় আধঘণ্টা বাকী। আপাততঃ আর কোন কাজ হাতে না থাকায় অজয় প্রার্থিনীদের প্রতি দৃষ্টি দিল।

প্রথমই তার চোখে পড়ল সকলের উগ্র বেশভূষার প্রতি। এরা চাকরীর না বিয়ের, কিসের উমেদারি করতে এসেছে অজয় বুঝে উঠতে পারল না। অর্দ্ধবক্ষোম্মুক্ত

ব্লাউজ, রঙ্গীন পাতলা শাড়ী, নীচে পরিদৃশ্যমান সায়া, কটিদেশের উর্দ্ধাংশ ঈষৎ উন্মুক্ত, মুখে উগ্র পাউডারের প্রলেপ বিচিত্র চুলের বাহার, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ—মিত্র সাহেব যে কাকে নির্ব্বাচন করবেন অজয় বুঝে উঠতে পারল না। আরও একবার ভাল ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অজয় প্রার্থিনীদের বয়স অনুমান করতে লাগল, এবার জৌলুসের অন্তরালে প্রায় প্রত্যেকেরই বিশীর্ণ দেহটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। ব্রণলাঞ্ছিত মুখ এবং মসীলিপ্ত অক্ষিকোটরকে ঢাকবার জন্যই যে পাউডারের উগ্র প্রলেপ দেওয়া হয়েছে এটা তার কাছে এবার পরিষ্কার হয়ে উঠল। বিচিত্র চুলের বাহারের রহস্যও আর অজ্ঞাত রইল না। চুলের একান্ত অভাবের জন্যই যে প্রচুর ফিতের সাহায্যে বাহারের সৃষ্টি করা হয়েছে তা সে বুঝতে পারল। অনিশ্চিত জীবনযাত্রার দুর্ভাবনা, স্বল্পাহারের সুস্পষ্ট ছাপ, সর্ব্বোপরি লাঞ্ছিত যৌবনের বেদনা সব কিছুরই একটা সুস্পষ্ট ছাপ এদের সর্ব্বদেহে যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে একটা বিদ্বেষের ভাব এদের প্রতি অজয়ের ছিল তা যেন একমুহূর্ত্তে উড়ে গেল। তার স্থানে দেখা দিল করুণা! আহা! হতভাগিনীর দল। রোদ, বৃষ্টি, ভীড়, ঠেলাঠেলি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে শুধু পেটের দায়ে এরা এসেছে চাকরী করতে। যাদের কাছে চাকরী করবে তারা কেমন লোক জানা নেই। তারা যে ভাল হয় না এ সম্বন্ধে অজয়ের যেন কোনই সন্দেহ নেই।

কেমন তার একটা ধারণা যে যারা লেডী ষ্টেনো-গ্রাফার রাখে তারা প্রায়ই সুবিধের লোক হয় না। তা ছাড়া আছে যেখানে চাকরী করবে সেখানকার চাপরাশী থেকে আরম্ভ করে মালিক পর্য্যন্ত সকলের লুব্ধ দৃষ্টি, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এবং নির্ল্লজ্জ হাসিঠাট্টা। এতৎসত্ত্বেও মেয়েদেরকে চাকরী করতে হয়। অজয়ের আরো ধারণা ছিল যে নিতান্ত সখে পড়েই মেয়েরা চাকরী করে। কিন্তু এদের চেহারা, ক্লান্ত দৃষ্টি অজয়কে পরিষ্কার বলতে লাগল যে এরা অত্যন্ত হতভাগিনী।

দশটা বেজেছে। হন্ হন্ করে মিত্রসাহেব অফিসে ঢুকলেন। নিজের চেম্বারে ঢুকবার পূর্ব্বে প্রার্থিনীদের প্রতি অপাঙ্গে একবার নজর দিলেন। পরক্ষণেই ঘণ্টা বেজে উঠল, ব্যস্ত ভাবে চাপরাশী গিয়ে সেলাম জানাল এবং পরমুহূর্ত্তেই অজয়ের ডাক পড়ল।

"সব Applicant-ই কি এসে গেছে?"

"না স্যার, ছ'জন এখনও আসেনি।"

"থাকগে, আপনি ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা করুন।"

"যাচ্ছি স্যার।"

অজয় প্রার্থিনীদের কাছে গিয়ে তাদের ইণ্টারভিউর কার্ডগুলো চেয়ে নিল এবং নম্বর অনুসারে পর পর সাজাল। দেখল শুমিত্রা দত্ত এবং রেবা রায় তখনও আসেনি। থাক্, এদেরকেই পর পর সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

এই ভেবে চেয়ার থেকে উঠতেই সিঁড়ির প্রতি তার নজর পড়ল। নজর পড়ল না বলে নজর একেবারে আবদ্ধ হয়ে গেল বলা চলে। নীল শাড়ী পরিহিতা, উন্নত দেহ, গৌর তনু এই মেয়েটিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই অজয়ের মনে হল চাকরীটা নিশ্চয়ই ও পাবে। মিনিট খানেকের মধ্যেই মেয়েটি অফিস কক্ষে এসে প্রবেশ করল। জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতেই অজয় বলে উঠল, "আপনি সুমিত্রা দত্ত, না রেবা রায়?"

"সুমিত্রা দত্ত।"

"বসুন।"

একে একে সবার ইণ্টারভিউ হতে লাগল। কিন্তু মিত্র-সাহেবের দৃষ্টি কিছুতেই প্রসন্ন হয়ে উঠল না। সকলের শেষে গেল সুমিত্রা। ছোট্ট একটি নমস্কার করে সে মিত্রসাহেবের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। অজয় লক্ষ্য করল মিত্রসাহেব একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। দু'এক কথার পরেই সোজাসুজি জিজ্ঞেসা করে বসলেন, "আপনি যদি selected হন তবে কবে থেকে join করতে পারবেন?"

"আমার তো এখন অবসরই আছে, যেদিন থেকে বলবেন সেদিন থেকেই আসতে পারি।"

"আচ্ছা। ইণ্টারভিউর ফলাফল শীগ্‌গিরই আপনি জানতে পারবেন।" তারপর অজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অজয়বাবু এদের সবাইকে এই কথাই জানিয়ে দিন।"

চাকুরীপ্রার্থিনীরা চলে গেল।

মিত্রসাহেবকে খুব উৎসাহিত মনে হতে লাগল। তিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত বললেন, "কি বলেন অজয়বাবু আমাদের লোকের যখন দরকার তখন আজই selection-টা করে ফেলা যাক না ?"

"সেই ভাল স্যার।" পরম অনুগতের মত অজয় বলল।

"আপনি তো ইণ্টারভিউর সময় আগাগোড়াই ছিলেন। কাকে select করা যায় বলে আপনার মনে হচ্ছে ?

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে অজয় বলল, "অনেকেই কাজ-কর্ম্ম জানে দেখলাম। তবুও তার মধ্যে সুমিত্রা দত্তকে বেশ smart বলে মনে হল।"

কে সুমিত্রা দত্ত এটা যেন বুঝতেই পারেন নি এরকম ভাব করে মিত্রসাহেব বললেন, "কোনটি সুমিত্রা দত্ত বলুন ত ?"

"ঐ যে সবার শেষে এল মেয়েটি, নীল শাড়ী পরা।"

"ও," একটুখানি হেসে মিত্রসাহেব বললেন, "আপনি একেবারে শাড়ীটা পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে রেখেছেন দেখছি।"

"না, না, ঠিক তা নয়," মহা লজ্জিতভাবে অজয় বলল, "সবার শেষে ছিল কিনা তাই খানিকটা..."

"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন ওকেই নেওয়া যাক। কালই একটা appointment letter পাঠিয়ে দিন। আমি বেরুচ্ছি।" মিত্রসাহেব বেরিয়ে গেলেন।

অজয় বেশ একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মিত্রসাহেব এমন একটা ভাব দেখালেন যেন তারই খাতিরে সুমিত্রা দত্তকে নেওয়া হলো। তবুও অজয় কেমন যেন মনে মনে একটু আনন্দিতই হলো। সুমিত্রা দত্ত! বেশ মেয়েটি!

সাহেবের ঘর থেকে অফিস কক্ষে ঢুকতেই সবাই একসঙ্গে অজয়কে ঘিরে ধরল, "কি ভায়া, পাত্রী পছন্দ হলো?"

"পাত্রী মানে?"

"তাছাড়া আর কি?"

"ছেলেদেরকে যখন নেওয়া হয় তখন তো বলেন না যে পাত্র পছন্দ করা হচ্ছে?"

"তাই বলতাম যদি মেয়ে-মনিব ছেলে-প্রার্থী নির্ব্বাচন করতেন।"

"আচ্ছা যা' খুশী বলুন গিয়ে," অজয়ের মুখে খানিকটা বিরক্তি।

"আহা-হা ভায়া চটছ কেন? কাকে নেওয়া হলো? দিনমানে অন্ততঃ দু'বার করে দর্শনও তো আমরা পাব। আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকব।"

"ছি, ছি, মানে, আপনারা এসব কি বলছেন? ভদ্র মহিলারা অভাবের দায়ে চাকরী করতে এসেছেন তাঁদের সম্পর্কে এসব কথা বলাটা কি ঠিক?"

"বলি ভায়া, অপ্সরাদের পোষাক পরিচ্ছদগুলোর দিকে

একবার লক্ষ্য করেছিলে কি? সাজসজ্জার বাহারটা কি একবার নজরে এসেছিল?"

"তা একটু ভদ্রভাবে আসবে না?"

"নাও, নাও, ন্যাকামী করো না। তারপর, বলো কার কপাল খুলল? নিশ্চয়ই শেষেরটি। নাম কি হে শ্রীমতীর?"

"সুমিত্রা দত্ত। কি করে বুঝলেন শেষেরটিকেই নেওয়া হলো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা। ভগবান না হয় কপালটাই খারাপ দিয়েছেন চোখদুটো তো আর অন্ধ করে দেন নি। আহা-হা, বেশ মেয়েটি! মিত্রসাহেবের কপাল ভাল।"

"আর আমার কপাল ভাঙ্গল," অজয় বিদ্রূপের সুরে বলল।

"না হে, সে ভয় নেই। মিত্রসাহেব এখন কিছুদিন খোস মেজাজে থাকবেন।"

"আচ্ছা, তাহলে তো ভালই।"

অফিস ছুটি হয়ে গেল। ট্রামে, বাসে প্রচণ্ড ভীড়। তবুও আজ ভীড়ের কষ্ট অজয়ের গায়ে লাগল না। সে শুধু ভাবতে লাগল বেশ মেয়ে এই সুমিত্রা দত্ত। নামটিও সুন্দর।

আরও কয়েকদিন পর। সুমিত্রার আজ কাজে আসবার কথা। ঘুম থেকে উঠেই অজয় ব্যস্ততা প্রকাশ করতে লাগল। বোনকে ডেকে বলল, "দেখ্, তাড়াতাড়ি অফিসে যেতে হবে। আর দেখ্ তো লণ্ড্রী থেকে আমার জামা-কাপড়গুলো আনা হয়েছে কিনা।"

"হ্যাঁ, একটা ধুতি আর একটা হাফসার্ট এসেছে।"

"আহা, হাফসার্ট কেন আমার পাঞ্জাবীটা কোথায় ?"

"পাঞ্জাবী আবার কোথায় ? চিরকাল তো হাফসার্টই গায়ে দিলে !"

"কেন একটা লংক্লথের পাঞ্জাবী আমার ছিল না ?" অজয় রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠল।

"সে তো কবে বাদ করে দিয়েছ ?"

"যাকগে, তুই দেখ রান্নার কতদূর ?"

"বাঃ, সবে তো সাড়ে সাতটা বাজে এত তাড়াতাড়ি করছ কেন ?"

"কেন তাড়াতাড়ি করছি সে কৈফিয়ৎ কি তোকে দিতে হবে? তোকে যা বলছি তাই কর গিয়ে।" অজয় দাড়ি কাটতে বসে গেল।

ন'টার কিছু আগেই অজয় অফিসে এলো। এসে দেখে মিত্রসাহেব এসে গেছেন এবং খবর নিয়ে জানল সুমিত্রা তার আগেই এসেছে।

অজয় তার নিজের সেক্সনে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অফিস কর্ম্মমুখর হয়ে উঠল। মিত্রসাহেবের সময়-নিষ্ঠা দেখে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। একজন বলেই বসল, "ওহে, আর লেট্ করা চলবে না। এবার থেকে মনিব দশটার আগেই আসবেন।"

ঘণ্টাখানেক পরে মিত্রসাহেবের ঘরে অজয়ের ডাক পড়ল। অজয় মিত্রসাহেবের বেশভূষার পারিপাট্য দেখে নিজের হাফসার্ট পরা চেহারার কথা মনে করে ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পড়ল। কিসের সঙ্গে কি? সে কিনা পাঞ্জাবী পরে সাতশত টাকা দামের স্যুট পরিহিত মিত্রসাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়েছিল। ছি, ছি, লজ্জায় তার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হতে লাগল। এক মুহূর্ত্তে সে মনটাকে দৃঢ় করে ফেলল। এসব পাগলামীর প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

"আমাকে ডেকেছেন স্যার?"

"হ্যাঁ, দেখুন মিস্ দত্তকে আপনার কয়েকদিন একটু দেখিয়ে শুনিয়ে নিতে হবে। আমি কয়েকটা নোট দিচ্ছি

আপনি টুকে নিন। মিস্ দত্তও টুকে নিচ্ছেন। তারপর দু'জনে মিলিয়ে ঠিকঠাক করে দেবেন। আর আমাদের অফিসের procedure ইত্যাদি কয়েকদিন আপনি ওঁকে একটু রপ্ত করিয়ে দেবেন। বুঝলেন ?"

"আচ্ছা, স্যার। তবে এস্টাবলিশমেণ্টে......'

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করছি! নিন্ লিখুন। মিস্ দত্ত আপনিও......"

"এই যে লিখছি।"

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে নোট নেওয়া হলো। মিত্র-সাহেব উঠে পড়লেন। টুপীটা হাতে নিয়ে বললেন, "আমি বেরুচ্ছি। চারটে সাড়ে চারটার মধ্যে আবার আসব। এর মধ্যে আপনারা এগুলো ঠিক করে রাখবেন।"

খালি ঘরে অজয় কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। সুমিত্রার দিক থেকে কিন্তু তেমন কিছু মনে হলো না। সে নির্ব্বিকার ভাবে বসে রইল। অবজ্ঞা ভরে খাতা ও পেন্সিলটা সে টেবিলের উপর ফেলে রাখল।

অজয় প্রথমে কথা বলল, "সবটা নোট নিশ্চয়ই আপনি নিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, তা এক রকম নেওয়া হয়েছে।" উপেক্ষার সঙ্গে উত্তর এলো।

"আপনি কি লিখে টাইপ করবেন না একেবারে নোট থেকেই টাইপ করে নেবেন ?"

"তা' এক রকম করলেই হলো।"

"তা' হলে......" অজয় একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

"আজকে আপনিই করুন না। পরে আমি..."

"মিত্রসাহেব বলছিলেন মিলিয়ে নিয়ে......"

"ও, এই নিন্ মিলিয়ে নিন্," নোট বইটা সুমিত্রা অজয়ের দিকে ছুঁড়ে দিল।

পাতা উল্টে নোট বইটা দেখে অজয় বিস্মিত না হয়ে পারল না। পাতা ভর্ত্তি শুধু লেখা রয়েছে সুমিত্রা দত্ত, সুমিত্রা দত্ত।

অজয় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, "এ কি! আপনি যে কিছুই নোট নেন নি? খাতায় শুধু দেখছি আপনার নাম রয়েছে?"

"আমার খাতায় আমার নামই তো থাকবে।" বেশ গম্ভীর ভাবে সুমিত্রা উত্তর দিল।

"তা তো ঠিকই কিন্তু নোট..."

"নোট তো আপনিই নিয়েছেন।"

"আপনি নেবেন না?"

"না, কোথায় আর নিলাম।" সেই উপেক্ষা, সেই হেঁয়ালি, সেই গম্ভীর স্বর!

"তা' হলে..." অজয় মাথা চুলকাতে লাগল।

"তা' হলে আবার কি? জানলে তো নোট নেব?" কোন সঙ্কোচ, কোন অস্পষ্টতা নেই।

অজয় কিছুই বুঝতে পারল না। গভীর সমস্যায় সে পড়ে গেল। ষ্টেনোগ্রাফারের চাকরী করতে এসেছে অথচ নোট নিতে জানে না। তবে কি টাইপও ?

"আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি, আপনি টাইপ করুন। নোট না হয় কাল থেকে নেবেন। প্রথম প্রথম একটু..."

"আর প্রথম প্রথম। বললাম তো আপনাকে, জানি নে। আজ কি রাতারাতি শিখে ফেলব ? আর ঐ টাইপও আমি জানি নে। যা হয় আপনি করুন।"

এবার অজয় রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠল। একটু রাগও হলো। সে না বলে পারল না, "আপনি তো দরখাস্তে লিখেছেন যে ষ্টেনোগ্রাফি ও টাইপ দু'টোই জানেন।"

"লিখেছিলামই তো। আপনারা তাইতো চেয়েছিলেন।"

"কিন্তু এখন বলছেন জানিনে।"

"তা' তখন বললে কি আর চাকরী হতো ?"

"তা' এখন চাকরী করবেন কি করে ?"

"নোট নেওয়া আর টাইপ করা ছাড়াও তো আরও কাজ আছে, তাই করব।"

"চাকরী হলো ষ্টেনোগ্রাফারের আর কাজ করবেন অন্য কিছু। তা' এই কাজ কে করবে ?"

"আপনি করবেন ?" সোজাসুজি সুমিত্রা বলে উঠল।

"বারে, তা কি করে হয়। আমি তো অন্য সেক্সনে কাজ করি।"

"অন্য সেক্সনে করবেন, এটাও চালিয়ে নেবেন।"

"তা কর্তৃপক্ষ রাজী হবেন কেন ?"

"কর্তৃপক্ষ তো মিত্রসাহেব, সে আমি ব্যবস্থা করে নেব'খন।"

"ভাল।" অজয় গম্ভীর হয়ে গেল।

"রাগ করলেন নাকি ?"

"না রাগ কিসের। ভাবছি আপনাদের কত সুবিধে।"

"সুবিধেই তো, না হলে আপনি তো বেশ ভাল কাজ জানেন, কি দরকার ছিল আরেক জনকে আবার। এস্টাবলিশ-মেণ্টের জন্যে একজন লোক আনলেই চলত।"

"সে ঠিক। যাকগে দাঁড়ান আমি এটা টাইপ করে ফেলি।"

অজয় এক মনে টাইপ করবার কাজে লেগে গেল। সুমিত্রা এবার ভাল করে অজয়কে দেখবার সুযোগ পেল। হঠাৎ কি যেন কি ভেবে সে অজয়কে জিজ্ঞেসা করল, "আচ্ছা, অজয়বাবু যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে পারি ?"

"না, না, মনে করবার কি আছে বলুন না।"

"আপনি এখন কত পান ?"

"পাঁচ বছর আগে আশী টাকায় ঢুকেছিলাম। এই কবছরে আর ২৫৲ টাকা বেড়েছে।"

"হুঁ। আর আমি এসেই দু'শ টাকা পাচ্ছি। চাই কি একটু চাপ দিলে আরও কিছু বাড়িয়েও নিতে পারি।"

"তা হয়তো পারেন।"

"আচ্ছা, আমাকে আপনার হিংসে হচ্ছে, না?"

"কেন বলুন তো? আপনার luck ভাল, আপনি আমার চেয়ে বেশী পাচ্ছেন তাতে হিংসে করব কেন? আমি যাতে বেশী পাই বরং সেই চেষ্টাই আমি করব।"

"তা' এখানে কি আর বেশী পাবেন?"

"অন্য কোথায়ও তো স্থবিধে মত পাচ্ছি নে।"

"অন্য কোথায়ও দেখুন।"

'হ্যাঁ, তা' বুঝতেই পারছি। এখানে বোধহয় আমার আর বেশীদিন থাকা চলবে না।"

স্থমিত্রা এ-কথার আর কোন উত্তর দিল না। অজয় কাজ করে যেতে লাগল আর ভাবতে লাগল স্থমিত্রার কথা। কি রকম সঙ্কোচমুক্ত। আজ প্রথম পরিচয়েই কত কথা বলে ফেলল। কোন আড়ষ্টতার বালাই নেই। তা' হবে না কেন? পাঁচ জায়গায় চাকুরী করে বেড়াচ্ছে, কত লোকের সঙ্গে মিশেছে।

"ভাল কথা অজয়বাবু, এখন তো কিছুদিন আমাদের একসঙ্গেই কাজ করতে হবে। আস্থন পারস্পরিক পরিচয়টা ভাল করে সেরে নিই।"

পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হলো।

"আপনি পাইকপাড়া থাকেন। সে তো অনেকদূর?" স্থমিত্রা বলল।

"না, অনেকদূর কোথায়? শ্যামবাজারের খুব কাছেই।"

"তাই নাকি, আমি পাইকপাড়া কখনও যাই নি।"

"যাবেন একদিন ?"

"তা যেতে পারি।' সুমিত্রা হেসে জবাব দিল।

"ও, সাড়ে তিনটা বাজে, মিত্রসাহেব হয়তো এক্ষুণি আসবেন। দাঁড়ান কাজটা শেষ করে ফেলি।"

খানিকক্ষণ পরেই মিত্রসাহেব এলেন। মুখে স্মিত হাসি, "এই যে মিস্ দত্ত, কাজ শেষ হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ স্যার, তা, প্রায়···এই যে অজয়বাবু!"

অজয় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হ্যাঁ, স্যার শেষ হয়ে গিয়েছে।"

"বাঃ, বেশ হয়েছে তো! কেমন মনে হচ্ছে, অজয়বাবু ? তাড়াতাড়ি উনি pick up করে নিতে পারবেন তো?"

"হ্যাঁ, তা পারবেন বৈকি।"

"তা, বেশ। আজ আর আমি বসব না। চললাম, মিস্ দত্ত। কাল ভাল করে কথাবার্ত্তা হবে।"

মিত্রসাহেব চলে গেলেন।

অজয় একটুখানি ইতস্ততঃ করে বলল, "আপনি না হয় একটু বসুন, ছুটির তো আর বেশী দেরী নেই। আমি ওদিকের কাজটা একটু দেখি গিয়ে।"

"আচ্ছা আসুন।"

অফিস ঘরে ঢুকতেই সবাই অজয়কে ঘিরে ধরল। নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ। অজয় বড়ই বিব্রত বোধ করল।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে অফিস ছুটি হয়ে গেল।

পরের দিন।

সুমিত্রা ঠিক সময় মতই এসেছে। মিত্রসাহেব এখনও আসেন নি। অফিস আরম্ভ হয়েছে একঘণ্টার বেশী হয়ে গেল। মিত্রসাহেবের ঘরেই সুমিত্রা বসেছে। একা বসে থাকতে থাকতে তার বিরক্তি ধরে গেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে ঘণ্টা মারল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন চাপরাশী দৌড়ে ঘরে ঢুকে সেলাম ঠুকল।

"মিত্রসাহেব কখন আসবেন?" সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"তাতো বলতে পারিনে, মেম সাহেব।"

মেম সাহেব! সুমিত্রা মনে মনে হাসল।

"আচ্ছা! অজয়বাবু এসেছেন?"

"হ্যাঁ, তিনি তো অনেকক্ষণ এসেছেন।"

"তাঁকে একটু আসতে বলবে?"

"এক্ষুণি বলছি।"

খানিকক্ষণ পরেই অজয় এলো।

"কি খবর, মিস্ দত্ত? সাহেব এখনও আসেন নি?"

"না তো।"

"কি আবার হলো?"

"তা' আমি কি করে বলব? আপনাদের সাহেব আপনারাই ভাল বলতে পারেন।"

"এবার থেকে আপনিই ভাল বলতে পারবেন।"

"দেখা যাক। একলা বসে বসে কি করি বলুন তো?"

"বসুন না, উনি হয়তো এক্ষুণি এসে যাবেন।"

"আপনি বসুন, আপনার কাছ থেকে অফিসের খবর নিই।"

"একটু অপেক্ষা করুন তাহলে। হাতে একটু কাজ আছে সেরে আসি।" অজয় বেরুতে যাবে তক্ষুণি মিত্রসাহেব এসে গেলেন।

"গুড্ মর্ণিং মিস্ দত্ত, কতক্ষণ এসেছেন?" র‍্যাকে টুপীটা রাখতে রাখতে মিত্রসাহেব বললেন।

সুমিত্রা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, "দশটার সময়ই এসেছি।"

"ওঃ! অনেকক্ষণ বসে আছেন। আমার আসতে আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।" তারপর বিনয়ের অবতার হয়ে বললেন, "বুঝতেই তো পারছেন, খেটে খেতে হয়। পাঁচ জায়গায় ঘুরে পাঁচজনকে খোসামোদ করে এলাম।"

সুমিত্রা একটু স্মিত হাসল।

মিত্রসাহেব আসনস্থ হলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন এবং চক্রাকারে ধূম উদ্গীরণ করতে করতে বেশ ঘনিষ্ঠতার সুরে বলতে আরম্ভ করলেন, "কালকে তো আপনার সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হতে পারল না। একসঙ্গেই যখন থাকব তখন উভয়ে উভয়ের খোঁজ খবরটা রাখা ভাল, কি বলেন?"

"তা তো বটেই।"

"আপনি থাকেন কোথায়?"

"প্রতাপাদিত্য রোড।"

"ওহ্! তাহলে তো আমার খুব কাছেই, আমি থাকি কবীর রোডে।"

"আপনি এর আগে কোথায় না কাজ করতেন?" মিত্রসাহেব জিজ্ঞেসা করলেন।

"একটা মারোয়াড়ী ফার্মে।"

"তা' সেটা ছেড়ে দিলেন কেন? Excuse me, কিছু মনে করবেন না।"

"না, না, মনে করবার কি আছে। পোষাল না।"

"তাদের আপনাকে যে কোন উপায়ে রাখা উচিত ছিল। Where they will get such a smart and a brilliant lady? অবশ্য তাহলে আমি নিজেকে unfortunate ভাবতাম।"

"Thank you for your compliment."

"না, না, compliment নয়। যা fact তা মানতেই হবে।"

অতঃপর উভয়ের বাড়ির খবরাদির আদান প্রদান হলো। সুমিত্রা জানতে পারল মিত্রসাহেব বিবাহিত। একটি ছেলেও আছে।

"আসুন মিস্ দত্ত, এবার আমার অফিস সংক্রান্ত কথাবার্ত্তাগুলো সেরে ফেলা যাক।"

"হ্যাঁ স্যার, সেটাই আসল কথা।"

"দেখুন মিস্ দত্ত, আমার এখানে অফিসিয়্যাল কাজ যে খুব বেশী তা' নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে…" মিত্রসাহেব একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

"আউটডোর কাজ বুঝি বেশী?"

"না, ঠিক তাও নয়। ব্যাপারটা কি বুঝলেন my firm is essentially a contractor's firm. কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। ঠিক শুধু কণ্ট্রাক্টরী করলে তো আর চলে না। তাই অন্যান্য জিনিষপত্র সম্পর্কেও negotiation করতে হয়।"

সুমিত্রা ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। তাই শুধু বলল, "ও!"

"আপনি বোধহয় ঠিক ধরতে পারেন নি।"

"হ্যাঁ স্যার, ঠিকই বলেছেন", হেসে সুমিত্রা জবাব দিল।

মিত্রসাহেব দেখতে পেলেন সুমিত্রার হাসিতে যেন

মুক্তা ঝরে পড়ল। কি জানি কি তাঁর মনে হলো, তিনি ঠিক করলেন এর কাছে সব কিছুই বলতে হবে। আর তা' ছাড়া সুমিত্রার মত মেয়েকে ঠিকমত tackle করতে পারলে কাজের অনেক সুবিধে হবে।

"ব্যাপারটা হলো গিয়ে বুঝেছেন, সাদা কথায় যাকে বলে দালালি। লোহা, সিমেণ্ট, কাপড়চোপড়, ওষুধপত্র সব কিছুর বাজারে আজকাল অসম্ভব demand. আমি বিভিন্ন source থেকে এগুলি যোগাড় করি এবং বিক্রি করি। বুঝতেই পারছেন এতে লাভ মন্দ হয় না। তবে আজকাল এসব কাজকর্ম্ম করা বেশ একটু risky. Reliable party চাই, না হলে ঠিকমত জিনিষটা manage করা যায় না। তাই সবচেয়ে আমার বেশী দরকার হয়ে পড়েছে একজন reliable friend. অনেক জায়গায় যেতে হয়, অনেক লোকের সঙ্গে কথা কইতে হয়, সব একা পারা যায় না। তা' ছাড়া এসব ব্যাপারে খুব presence of mind থাকা চাই, বুঝলেন তো? আমার কেন মনে হচ্ছে আপনি এসব কাজ খুব ভাল পারবেন।" মিত্রসাহেব অনেকটা প্রার্থনার দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকালেন।

সুমিত্রা ইতস্ততঃ করতে লাগল। কি বলবে ভেবে পেল না।

"না, না, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই।" মিত্রসাহেব সুমিত্রাকে উৎসাহিত করলেন।

"না স্যার, আমি তা' ভাবছিনে। এসব ব্যাপারে ঠিক অভিজ্ঞতা নেই কিনা, তাই ভাবছিলাম—" তারপরে হঠাৎ থেমে গিয়ে সুমিত্রা বলে উঠল, "আচ্ছা স্যার, অজয়-বাবুকে আপনি কোনদিন বলেন নি এসব কথা? তিনি বোধহয় আমার চেয়েও ভাল পারবেন।"

"Oh! no, he is a bit idealist. জানেন তো ব্যবসায়ে idealism-এর স্থান নেই। অজয়বাবু অফিসে আসেন, যান, duty করেন, বেশ ভাল চিঠিপত্র লিখতে পারেন that's all. এসব জিনিষ বোধহয় তাঁর মাথায় ঢুকবেও না।"

কেন জানি মিত্রসাহেবের কথা শুনে সুমিত্রা খুশী হলো। নতনেত্রে সে চুপ করে বসে রইল। বোধহয় অজয়ের কথাই ভাবতে লাগল।

"কিচ্ছু ভাববেন না মিস্ দত্ত, আমি আপনাকে trial দিয়ে ঠিক করে নেব। You will rather find interest in it."

"সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু কি ভাবে আপনার কাজের সাহায্য করব বুঝতে পারছি নে?"

"আপনাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না। কতকগুলো পার্টি আছে, তাদের সঙ্গে আপনাকে introduce করে দেবো, তারপর কাজ করতে করতে আপনি সবই বুঝতে পারবেন।"

"আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে।"

"ঠিক আছে। দেখবেন কোন অসুবিধে হবে না। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আপনাকে জায়গাগুলো দেখিয়ে আনব।"

"কি জায়গা ?"

"Place of interest. Of course to me and I think it will be to you also."

"কোথায় ?"

"কলুটোলা, বড়বাজার, চৌরঙ্গী—আরও নানা জায়গা।"

সুমিত্রা চুপ করে রইল। ভাবতে লাগল, না জানি অদৃষ্টে কি আছে। তবে এবার আর ছাড়া চলবে না। দেখতে হবে ভাগ্য কোথায়, নিয়ে যায়।

অফিস ছুটির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি এলো। নীচে রাস্তার ধারে সিঁড়ির মুখে কেরাণীরা দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় মিত্রসাহেব সুমিত্রাকে নিয়ে নীচে এলেন এবং দুজনেই একসঙ্গে গাড়ী করে চলে গেলেন। অপেক্ষমান কেরাণীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল, কেউ বা মুখ টিপে হাসল। ভাবখানা এই যে, যা' ভেবেছিলাম তা'ই হচ্ছে। তবে এত শীগ্‌গির যে হবে তা' আশা করা যায়নি।

অজয়ও এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে কিছুতেই সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় যোগ দিতে পারল না।

অজয়ের গম্ভীর মুখ স্থমিত্রার দৃষ্টি এড়ায় নি।

গাড়ীতে বসে বসে সে অজয়ের কথাই ভাবছিল। ডালহৌসি ছেড়ে গাড়ী ততক্ষণ রেড্ রোডের পথ ধরেছে। অজস্র ধারায় তখন বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং তারি সঙ্গে তাল রেখে দমকা হাওয়া বারেবারেই স্থমিত্রাদের গাড়ীতে এসে আছড়ে পড়ছে। একঘণ্টার বৃষ্টিতেই গড়ের মাঠে প্রচুর জল জমে গিয়েছিল। সমস্ত মাঠটাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা বিরাটকায় হ্রদ। স্থমিত্রা আনমনা হয়ে পড়ল।

"এখন কি করে বাড়ি যাবেন, মিস্ দত্ত?" মিত্রসাহেব নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

"যেতেই হবে, সবাই ভাববে?"

"এখন অন্ততঃ তিন ঘণ্টা ট্রাম চলবে না। বাসেও উঠতে পারবেন না।"

"আপনি কি অন্য কোথায়ও যাবেন?"

"না, না, তার জন্যে নয়। আপনাকে অনায়াসেই পৌঁছে

দিতে পারি। তাতে বরং আমি আনন্দিতই হব। তবে আমি বলছিলাম কি এখন বাড়িতে না গেলে যখন চিন্তার কারণ নেই তখন চলুন না একটু ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবেন ?"

"বিশেষ কোথায়ও নয়। চলুন আমাদের ক্লাবে। আজ এখন আর কেউ বাড়ি ফিরবে না, সবাই direct ক্লাবে চলে যাবে। সবার সঙ্গে দেখাও হবে, চলুন না ?" মিত্রসাহেবের সুরে অপরিসীম আগ্রহ।

"বেশ চলুন।" অনেকটা নির্লিপ্ত কণ্ঠে সুমিত্রা জবাব দিল।

গাড়ী তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছাকাছি এসে পড়েছে। মিত্রসাহেব লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী ঘোরাতে আদেশ দিলেন।

খানিকক্ষণ নীরবতা।

"আচ্ছা মিস্ দত্ত, এই বাদলার দিনে সকলেরই মন যেন একটু কেমন কেমন করে, না ?" যেন নিতান্ত অন্য কোন কথা না থাকায় মিত্রসাহেব এই কথাটি পাড়লেন।

সুমিত্রা বেশ একটু বিস্মিত হলো। তবে নীরব থাকাটা ভাল মনে হলো না। সহজ কণ্ঠে সে বলল, "কবিরা তো তাই বলেন।"

"কোন্ কবি ?"

"হালে রবীন্দ্রনাথ। পূর্ব্বে আরো অনেকে। যেমন বিদ্যাপতি, কালিদাস প্রভৃতি।"

"আমি এত খোঁজ রাখিনে। তবে এটুকু বলতে পারি বর্ষার দিনে আমার মন কেমন উদাস হয়ে যায়, মনে হয় যেন কেউ কোথায়ও নেই, চারদিক শূন্য, কি করে সময় কাটাই ভেবে পাইনে। খালি মনে হয় এমন একজন যদি কেউ থাকত, যার কাছে······", মিত্রসাহেব একটু থেমে হেসে বললেন, "এই আর কি।"

"রবীন্দ্রনাথও প্রায় এইরকম কথাই বলেছেন।"

কিছুক্ষণ মিত্রসাহেব চুপ করে রইলেন।

"আচ্ছা মিস্ দত্ত, আপনি তো অনেক পড়াশুনা করেছেন, বলুন তো এই উদাস মনকে কি করে শান্ত করা যায়? কবিরা কি কিছু উপায় বলেন নি?"

"কি······জানি?" মিত্রসাহেব কি বলতে চাচ্ছেন সুমিত্রা বুঝতে পারল না।

"প্রেয়সী, প্রিয়া ইত্যাদি কিছুই বলেন নি?" মিত্রসাহেবের কণ্ঠে কৌতুকের সুর বেজে উঠল।

"তা হয়তো বলেছেন কিন্তু আমি এত ভেবে দেখি নি।" সুমিত্রা প্রসঙ্গ এড়াতে চাইল।

"আচ্ছা সে আর একদিন হবে। আমরাও প্রায় এসে গেলাম।" এই বলে ব্যস্ত হয়ে মিত্রসাহেব জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন এবং পরক্ষণেই গাড়ীতে গা এলিয়ে দিলেন। একটু আরাম করবার জন্যেই দু'দিকে দু'টি হাত ছড়িয়ে দিলেন। নিতান্ত অসতর্কভাবেই বোধহয় একটি হাত

স্নমিত্রার ঘাড়ে এসে ঠেকল। মিত্রসাহেব অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলেন, "এই যে, আমরা এসে পড়েছি।"

"দেখুন মিঃ মিত্র, আমি কিন্তু বেশী দেরী করতে পারব না।" স্নমিত্রা বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই বলল।

"না, না, দেরী আর কি? চলুন না।"

দোতলায় একটা হলের দরজায় মিত্রসাহেব এসে দাঁড়ালেন। স্নমিত্রা তখনও দু'তিনটা সিঁড়ি নীচে আছে। হলের ভেতর থেকে সোল্লাস আহ্বান এলো।

"আস্থন মিস্ দত্ত।" মিত্রসাহেব স্বর চড়িয়ে বলে উঠলেন। তারপরে অকস্মাৎ স্নমিত্রাকে চকিত করে দিয়ে তিনি তার গলায় হাত রাখলেন এবং পরম বন্ধুভাবে তাকে হলের ভিতরে নিয়ে গেলেন। স্নমিত্রা যুগপৎ বিস্মিত, বিরক্ত ও চকিত হয়ে উঠল। কিন্তু সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী। কোনরকম ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেতে দিল না।

হলে তখনও পুরোমাত্রায় আসর জমে নি। তবে অনেকেই এর মধ্যে এসে গেছেন। উজ্জ্বল আলোকে স্নমিত্রার দৃষ্টি ঝলসে গেল! বিরাট কক্ষ। মেঝে খুব পুরু কার্পেটে মোড়া। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কোচ। দেয়ালে বিচিত্র ভঙ্গিমায় আঁকা নানাদেশের নারীর ছবি। আর ছবির পাশে পাশে রয়েছে মানুষসমান লম্বা এক একটি আয়না। কক্ষের একদিকে একটা কাউণ্টারের মত রয়েছে। কাউণ্টারের পেছনে অনেকগুলো কাচের আলমারি। আলমারিতে নানা

রঙবেরঙের বোতল। সুবেশ চাপরাশীর দল হুকুমের অপেক্ষায় ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাউন্টারের ঠিক বিপরীত দিকে ছোট একটা গ্যালারীর মত রয়েছে। তাতে আট দশজন লোক নানা বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে কতকগুলো দরজা দেখা যাচ্ছে। তবে দরজাগুলো বন্ধ।

এইরকম বিচিত্র পরিবেশে সুমিত্রা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও পড়েনি। সে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অস্বস্তি আরও দশগুণ বেড়ে গেল যখন সে দেখতে পেল কোচে উপবিষ্ট প্রত্যেকটি লোকই তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

তা তাকিয়ে থাকবারই কথা। তীব্র উজ্জ্বল আলোকে সুমিত্রাকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। সুমিত্রার একটু হাত নাড়াতে বা নড়াচড়াতে সমস্ত ঘরে যেন আলোর কম্পন খেলে যাচ্ছিল।

একটু ধাতস্থ হয়ে সুমিত্রা ঘরের লোকগুলোর দিকে যথাসম্ভব অন্যের দৃষ্টির বাইরে নজর দিল। বিচিত্র বেশভূষা পরিহিত এই লোকগুলো যে কারা সুমিত্রা তা বুঝে উঠতে পারল না। কেউ বা স্যুট কোটে একেবারে খাঁটি সাহেব, কেউ বা জাব্বাজোব্বায় পাকা বোম্বাইওয়ালা, কেউ বা শেরওয়ানী পাগরিতে খাঁটি মাড়োয়াড়ী। ধুতি চাদর পরিহিত বাঙ্গালীও কয়েকজন আছেন।

আরও একটা ব্যাপার দেখে সুমিত্রা বিস্মিত হলো। প্রত্যেকটি লোকেরই পার্শ্বে এক একজন করে মহিলা বসে আছেন। তাঁদের পোষাকের পারিপাট্যও চোখ ঝলসে দেয়। এঁদের মধ্যে বিবাহিতা মহিলাও কয়েকজন আছেন। বোধহয় স্বামীর সঙ্গে আনন্দ করতে এসেছেন।

মিত্রসাহেবের পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিটি দাঁত বের করে একেবারে বিগলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "উনি ?"

"আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী।" বেশ যেন গর্ব্বের কণ্ঠে মিত্রসাহেব জবাব দিলেন।

তেমনি বিগলিত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "আপনার পছন্দকে ধন্যবাদ।"

মিত্রসাহেবও বিগলিত হয়ে উঠলেন এবং সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিস্ দত্ত, উনি হচ্ছেন মিঃ এন, সি, দত্ত। কাপড়ের হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট। বালীগঞ্জে এঁদের বিরাট বাড়ি রয়েছে।" একটু শুষ্ক হাসি হেসে সুমিত্রা মিঃ দত্তকে নমস্কার জানাল। মিঃ দত্ত আরও বিগলিত হয়ে পড়লেন। সুললিত কণ্ঠে বললেন, "মিঃ মিত্র, এঁকে নিয়ে একদিন আমার ওখানে যাবেন।" তারপর সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বিনয়ে একেবারে নুয়ে পড়ে বললেন, "যাবেন তো, মিস্ দত্ত ?"

"যাব।" এর বেশী কথা সুমিত্রার মুখ দিয়ে বেরোল না।

মিঃ এন, সি, দত্তের পাশেও একজন সুবেশধারিণী তরুণী বসেছিল। তার দিকে তাকাতেই সে মৃদু হাসল। মিত্রসাহেব

তাড়াতাড়ি সুমিত্রাকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনি হচ্ছেন মিস্ বনশ্রী রায়, মিঃ দত্তের P. A." সুমিত্রা বনশ্রীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করল। বনশ্রীর সঙ্গে আলাপ করে সুমিত্রা জানতে পারল এখানে যেসব মহিলা এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই কারুর স্ত্রী অথবা প্রাইভেট সেক্রেটারী। "স্ত্রী না হয় প্রাইভেট সেক্রেটারী" সুমিত্রার হাসি পেল।

সুমিত্রা আরও জানতে পারল যে এই ক্লাবটি এই ব্যবসায়ীর দলই চালিয়ে থাকেন। উদ্দেশ্য কিছু মন্দ নয়, সারাদিন খাটা খাটুনীর পর একটু নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করা। বনশ্রী মুখ টিপে বলল "বসুন না অনেক মজার ব্যাপার দেখতে পাবেন।"

সুমিত্রা চুপ করে রইল।

মিঃ দত্তের পাশেই বসেছিলেন বড়বাজারের বিরাট বস্ত্র ব্যবসায়ী শেঠ বুধুরাম চৌপটমল। তাঁর সঙ্গে সুমিত্রার পরিচয় হলো।

এমন সময় কে যেন বলে উঠল, "আর কত দেরী?"

"বোধহয় আর বেশী দেরী হবে না। এক্ষুণি এসে পড়বেন।" কাউন্টারের সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি উত্তর দিলেন।

তার কিছুক্ষণ পরেই একজন বেয়ারা হন্তদন্ত হয়ে এসে হলে ঢুকল এবং ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, "বড় হুজুর আ' গিয়া।" অনেকেই গা এলিয়ে কোচে শুয়েছিলেন। মহা

ব্যস্তভাবে তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন। মিত্রসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রাও উঠে দাঁড়াল।

পরক্ষণেই যে ব্যক্তিটি হলে এসে ঢুকলেন তাঁকে দেখে সুমিত্রা একেবারে অবাক হয়ে গেল। শুভ্র খদ্দর ও মাথায় গান্ধীটুপি পরিহিত এই ব্যক্তির ছবি প্রায়ই খবরের কাগজে সুমিত্রা দেখতে পায়। ইনিও এখানে আসেন?

তিনি এসে বসতেই সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন এবং নানারকম তোয়াজের কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। বড় হুজুর মৃদুমন্দ হেসে সবাইকে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক পর সবাই যাঁর যাঁর আসনে গিয়ে বসলেন।

খানিকক্ষণ নীরবতা।

একটু পরেই যে দরজাগুলো এতক্ষণ বন্ধ ছিল সেগুলো পটাপট্ খুলে গেল এবং একদল নর্ত্তকী হলের মাঝখানে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুমিত্রা সচকিত হয়ে উঠল। এ ধরণের নর্ত্তকী সে ইংরাজী সিনেমাতেও দেখে নি। নর্ত্তকী-দের মধ্যে সর্ব্বদেশের নারী রয়েছে। সবাই রূপসী না হলেও বেশ স্বাস্থ্যবতী। যেন অনেক বাছাই করে এদেরকে যোগাড় করা হয়েছে।

গ্যালারীতে উপবিষ্ট বাদকের দল বাজনা আরম্ভ করল। নর্ত্তকীরা উদ্দাম গতিতে সমস্ত কক্ষকে আলোড়িত করে তুলল। নর্ত্তকীদের নিম্নাঙ্গে ছয় ইঞ্চি পরিমিত এক-

একখানা পরিধেয় ছিল। উর্দ্ধাঙ্গ আবৃত ছিল এক একখানি ওড়নায়। দু'হাত উপরে তুলে যখন তারা ওড়না ঘোরাচ্ছিল তখন তীব্র আলোকরশ্মিতে কিছুই অদৃশ্য থাকছিল না। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কক্ষ অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ ফটাফট্ শব্দে সুমিত্রা কাউন্টারের দিকে মুখ ফিরাল। বোতল খোলার শব্দ যে এ রকম হতে পারে তা দেখে সে অবাক হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য গ্লাসে পানীয় ভর্ত্তি করা হয়ে গেল এবং বেয়ারার দল প্রভুদের মধ্যে অতি দ্রুত সেগুলো বিতরণ করে দিল। মিত্রসাহেবও বাদ গেলেন না। এতে আর অবশ্য সুমিত্রা আশ্চর্য্য হলো না। এটা সে আগে থেকেই ধরে নিয়েছিল।

এবার আসর আরও জমে উঠল! সবিস্ময়ে সুমিত্রা লক্ষ্য করল যে, নর্ত্তকীদের গায়ের ওড়নাগুলো মেঝেয় লুটোচ্ছে। বিচিত্র লাস্যময় ভঙ্গীতে তারা নেচেই চলেছে। দুয়েকজন রসিক প্রভু উঠে গিয়ে তাদের মুখে গ্লাস ধরছেন। সুমিত্রা আরও লক্ষ্য করল যে প্রত্যেকটি লোকেরই দৃষ্টি নর্ত্তকীদের কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর নিবদ্ধ রয়েছে।

সুমিত্রার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল যখন সে দেখতে পেল যে সমাগত ভদ্রমহিলারাও এই হুল্লোড়ে যোগ দিয়েছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী ও স্ত্রীর পার্থক্য ঘুচে

গেল। এমন কি ঘৃণার সঙ্গে সে দেখল যে বিবাহিত মহিলারা স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে যার তার সঙ্গে গলা জড়িয়ে ধেই ধেই করে ঘুরে বেরাচ্ছে। তা' করুক গিয়ে কেউ যদি তার স্ত্রীকে দিয়ে এসব কাজ করাতে লজ্জা বোধ না করে তাতে অন্যের কি এসে যায়।

কিন্তু এই লেডী ষ্টেনোগ্রাফারের দল? এদের কি লজ্জা নেই? এই জন্যই না এদেরকে লোকে দেখতে পারে না? এত মুখরোচক কুৎসা রচনা করে। পরক্ষণেই ভাবল এদেরি বা দোষ কি? বোধ হয় সুমিত্রার মতই তাদের অবস্থা। পেটের দায়ে ক্রমে হীনতা স্বীকার করতে হয়, পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এখন যদি মিত্রসাহেব তার হাত ধরে টানতে আরম্ভ করেন তবে সে কি করতে পারে?

সুমিত্রা ভাবতে লাগল শালীনতা বোধ, মনুষ্যত্ববোধ কতখানি অধঃপতিত হলে মানুষ এত নীচে নেমে যেতে পারে?

সুমিত্রার ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কতক্ষণে সে বেরিয়ে যাবে এই হলো তার চিন্তা। কোন ভদ্রমেয়ের পক্ষে এখানে থাকা যে চরম অপমান তা সে বুঝতে পেরেও নিরুপায় হয়ে রইল। মিত্রসাহেবেও উঠে গেছেন। ওর কাছে, তার কাছে গিয়ে ফিস্‌ফাস্ শব্দে কি যেন বলছেন। কাগজ পেন্সিল বের করে কিছু যেন টুকেও নিচ্ছেন।

নিঃসন্দেহে লেনদেনের ব্যাপার চলছে, এখন কোন কথাই তিনি শুনবেন না। অগত্যা সুমিত্রার বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিত্রসাহেব এলেন। সুমিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, "Good Luck, মিস্ দত্ত! সত্যি আপনার ভাগ্যে অনেক কিছু হয়ে গেল। বেশ কয়েকটা deal আজ করে ফেলেছি।"

"ভাল। চলুন এখন বেরিয়ে পড়ি।"

"হ্যাঁ, এই তো যাব। দাঁড়ান একটু, বড় হুজুরের কাছ থেকে একশ' টন সিমেণ্টের পারমিটের ব্যবস্থা করে নিই। অনেকটা নরম হয়ে এসেছেন, আর একটু কচলালেই আদায় হয়ে যাবে।"

"এখানেই কি পারমিট লিখে দেবেন?"

"আরে না, তা' কি হয়। আজ ভিজিয়ে রাখব, পরে গেলেই পেয়ে যাব।"

"আর কি, কি আদায় হলো।" কথাটা জিজ্ঞেসা করবার সুমিত্রার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু কেমন যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"ওঃ! অনেক কিছু, আপনাকে পরে বলব। আর তা' ছাড়া আপনাকে তো নিয়েই যাব, তখন দেখতে পাবেন।"

"আচ্ছা, সে হবে। এখন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করুন। প্রায় দশটা বাজে।"

"এই তো হলো বলে।" মিত্রসাহেব আবার ভীড়ে মিশে গেলেন।

উদ্দাম হুল্লোড় বেড়েই চলেছে। কয়েকজন ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোচে গা এলিয়ে দিয়ে যেন তারা নূতন উদ্যম সংগ্রহ করছে। নর্ত্তকীরা এসে তাদের কোলে লুটিয়ে পড়ছে এবং উগ্র চুম্বনে তাদেরকে অধীর করে তুলছে। কোন কোন নর্ত্তকী সামনে এসে সমুন্নত দেহে দাঁড়িয়ে শুধু বিলোল কটাক্ষের সাহায্যে পানোন্মত্ত ক্লান্ত লম্পটের ক্ষুধা জাগ্রত করছে। প্রায় বিবসনা পুষ্টদেহের আকর্ষণ মাতালের দল কাটাবে কি করে? ঢুলুঢুলু নেত্রে নর্ত্তকীর গলা জড়িয়ে ধরতেই বিষাক্ত চুম্বনে সে তাকে আবার আকুল করে দিচ্ছে।

বড় হুজুর কিন্তু কোচ ছেড়ে উঠে আসেন নি। তিনি বড় হুজুর সুলভ গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বসে আছেন। নর্ত্তকীরা তাকে ঘিরে নাচছে এবং ইঙ্গিত পেলেই তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার প্রায় পরমুহূর্ত্তেই প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে তাঁর সামনে বসে দেহের উর্দ্ধাংশ উন্নত করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। ঘৃণায় সুমিত্রার দেহ একেবারে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে শুধু ভাবতে লাগল বড় হুজুরের এই অবস্থার একখানি চিত্র যদি গ্রহণ করে কাল লক্ষ্য সংখ্যা প্রচারিত দৈনিকে ছেপে দেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়! আর এই যে ব্যবসায়ীর দল, যারা

প্রতি মুহূর্তেই দেশসেবার গৌরব পেয়ে থাকে, তাদের কাহিনীটাও যদি ঐ সঙ্গে প্রচার করা যায় তবেই বা কেমন হয় ?

পরক্ষণেই সে ভাবল তার মালিকও ঐ দলেরই একজন লোক। পেটের দায়ে তাকে ওরকম একজন শয়তানের অধীনে চাকরী করতে হয়। না করেই বা উপায় কি ?

উঃ এগারোটা বাজে! আর বসে থাকা চলবে না। বাড়িতে কারও বোধহয় এখনও খাওয়াই হয় নি। সে কোচ ছেড়ে উঠে পড়ল। মিত্রসাহেবকে শুধু বলল, "আমি নীচে যাচ্ছি।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান আমি আসছি আপনাকে পৌঁছে দেবো।"

"না, দরকার নেই।"

এক মাতালের সঙ্গে সুমিত্রা এত রাত্রিতে একাকী গাড়ী চড়তে সাহস পেল না।

সারারাত্রি সুমিত্রার ঘুম হলো না। আজকের এই নারকীয় অভিজ্ঞতায় তার মন একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একদল চরিত্রহীন, হৃদয়হীন, মদ্যপের দল সমগ্র দেশকে নিয়ে কি ভাবে জুয়া খেলছে তা সে আজ নিজের চোখে দেখল। অথচ এরাই সমাজে মান্যগণ্য ব্যক্তি। এদেরি কথায় দেশ চলছে, অন্ততঃ এদেরকে অগ্রাহ্য করতে পারছে না। এদেরি ইঙ্গিতে আজ কি না হতে পারে? এদেরকে নিঃশেষে ধ্বংস করতে পারে সে শক্তি আজ কোথায়? দেশের সমগ্র শুভ শক্তিকে জাগ্রত করে এই সমস্ত ঘৃণ্য জীবদের সমূলে উচ্ছেদ করে দিতে পারে সেই মহাবলশালী ক্ষত্রিয়ের আবির্ভাব কবে হবে?

আর এদেরকে যদি সমস্ত সমাজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মেনে নেয় এবং এদের কৃপা ছাড়া যদি বাঁচবার উপায় না থাকে তবে কি করা যাবে? পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ধারণ করা ছাড়া কি উপায় নেই?

উপায় আছেই বা কোথায়? যে কয় জায়গায় চাকরীর

অভিজ্ঞতা সুমিত্রার হয়েছে তাতে তার তো মনে হচ্ছে এদেরকে মানতেই হবে। তাই যদি হয় তবে কি সে··· ? ভাবতেই তার গা শিউরে উঠল। সে অন্য কিছু ভাবতে চাইল। কিন্তু মন বারেবারে এদিকেই আসছে কেন? কাল সে অজয়বাবুকে জিজ্ঞেসা করে দেখবে ?

অজয়ের কথা মনে হতেই তার কেমন যেন সঙ্কোচ হতে লাগল। না জানি তিনি কি ভাবছেন ? যা হোকগে কাল সব কথা তাঁকে খুলে বলতেই হবে।

পরের দিন অফিসে এসেই সে অজয়ের খোঁজ করল। অজয় তখনও আসে নি। সেদিন অজয় এলো না।

তার পরের দিন খোঁজ করে জানতে পারল যে অজয়ের অসুখ করেছে। ছুটি চেয়ে সে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। অজয়ের অসুখের কথা শুনেই সুমিত্রার মনটা কেমন দমে গেল। কি আবার হলো ?

শনিবার দিন সুমিত্রা ঠিক করল যে, সে ছুটির পর অজয়ের বাড়ি যাবে। প্রথমটায় লজ্জা করতে লাগল। কি ভাববেন ? পরে আবার ভাবল এতে লজ্জা কি ? অন্য কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক, এক অফিসের লোক তো ! তাঁর অসুখে খোঁজ নেওয়াটা তো একটা কর্ত্তব্য। অফিস থেকে অজয়ের ঠিকানা সংগ্রহ হলো।

অনেক ইতস্ততঃর পর সুমিত্রা পাইকপাড়ার বাসে উঠল।

অজয় ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে একটা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। এখনও ফেরেনি। রমা আদর করে সুমিত্রাকে বসাল, "বসুন, বসুন, দাদা এক্ষুণি এসে পড়বে।" তারপরে সে মাকে ডেকে নিয়ে এলো, "মা, ইনি দাদাদের সঙ্গে কাজ করেন, দাদার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছেন।"

সুমিত্রা মাকে নমস্কার জানাল। মা স্মিত হেসে অভ্যর্থনা জানালেন, "বসো, হ্যাঁরে অজয় কোথায় গেল ?"

"এই তো বেরিয়ে গেছে। বোধহয় শ্যামবাজারের মোড়ে গেছে ম্যাগাজিন কিনতে, দেরী হবে না।"

মা ও মেয়ের সঙ্গে সুমিত্রার পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হলো। মা চলে গেলেন।

"আপনার দাদার ঘরে তো অনেক বই। খুব পড়েন বুঝি ?"

"আগে পড়ত, এখন বিশেষ পড়ে না।"

"দাদার বইগুলো একটু দেখব ?"

"বারে, দেখুন না ! এ আর জি[illegible]রছেন কি ?"

"বই নাড়াচাড়া করলে দাদা য[illegible]গ যান ?"

"তা যা বলেছেন, কিছুই অসম্ভব নয়, যে মানুষ ! তবে আপনি ধরেছেন শুনলে কিছু বলবে

"বাঃ, কেন ?" সুমিত্রা হেসে উঠল।

"ঠিক দেখবেন।" রমাও হেসে উঠল।

"আপনি ধরলে বুঝি রেগে যান ?"

"ওঃ! আমার ধরতে বয়ে গেল। রাগ করবে যে, আমি ঠিক করে গুছিয়ে না রাখলে কে রাখবে ?"

"তা' আপনাকে দাদা খুবই ভালবাসেন ?"

এবার রমার মুখ খুসীতে ভরে উঠল। আনন্দে ছোট্ট দু'টি গাল টোল খেয়ে উঠল। খুব লম্বা করে মাথাটি নেড়ে সে বলে উঠল "খুব।" তারপরেই হঠাৎ বলে উঠল, "আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন ?"

"বেশ, তুমিই বলব। আমাকে তুমি কি বলবে ?"

"সুমিত্রাদি।"

"না, শুধু দিদি, কেমন ?"

"আচ্ছা।"

"আর দিদিই যদি বল তবে 'আপনি' বলবে কি করে ?"

"তবে তুমিই বলব, কিন্তু ভারি লজ্জা করে ?"

"লজ্জা কিসের !"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আসর জমে উঠল। আধঘণ্টার মধ্যেই দু'জনের মধ্যে এমন ভাব হয়ে গেল যে, কেউ দেখলে ভাবতেই পারবে না—ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেও একটি মেয়ে আরেকটির নাম পর্য্যন্ত জানত না। এরা যেন কত জন্মজন্মান্তরের সখী। বাস্তবিকই এই সহজ অন্তরঙ্গতা একমাত্র মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। জমে যেতেও বেশীক্ষণ লাগে না আবার ছাড়াছাড়ি হতেও বেশীক্ষণ লাগে না। এই তোমার জন্যে

প্রাণ দিচ্ছি আবার এই তোমার মুণ্ডপাত করছি। এর একটা প্রধান কারণ হয়তো এই যে মেয়েদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির একান্ত অভাব রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির আবরণের অন্তরালে পুরুষের যে মন তাহা অত্যন্ত সতর্ক ও অনুভূতিশীল। খুব অনুভূতিশীল বলেই বুদ্ধিবৃত্তির আবরণে তাহা আচ্ছাদিত থাকে। সহজে সেখানে পৌঁছান খুবই শক্ত। বুদ্ধিবৃত্তির পরতে পরতে, ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে যুক্তি, তর্ক ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির প্রাচীর। তা' ভেদ করে সহজে তার মনে যাওয়া যায় না। তবে একবার যদি যেতে পার তবে চিরদিনের মত সেইখানে তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত হলো। তার সংবেদনশীল মন তোমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। প্রশান্ত বারিধি যদি তরঙ্গাকুল হয়ে উঠে তবে সহজে সে শান্ত হয় না। মেয়েদের মনও যথেষ্ট সংবেদন ও সহানুভূতিশীল সন্দেহ নেই। তবে তার উপরে কোন আবরণ নেই। জিহ্বায় কোন জিনিষ পড়লে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা একাত্ম হয়ে যায় কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে তার স্বাদ হারিয়ে ফেলে। মেয়েরাও তাই। দেখা হলো, আলাপ হলো একেবারে গলাগলি ভাব। যে কোন মুহূর্ত্তেই এই গলাগলি ভাব হাতাহাতিতে পরিণত হতে পারে। তবুও রমা ও সুমিত্রার ভাব দেখে যে কোন ব্যক্তিরই আনন্দিত হবারই কথা।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

"এই যে, দাদা এসেছে।" রমা ছুটে গেল।

"বল তো দাদা, কে এসেছে ?" রমা অজয়ের হাত ধরল।

"বাঃরে আমি কেমন করে জানব ? কে ?"

"বলব না তো !"

"বেশ, বলতে হবে না।" অজয় ততক্ষণ তার ঘরের সামনে এসে হাজির হয়েছে। দূর থেকেই একজোড়া মেয়েদের জুতো দেখে সে ভাবছিল কে এলো ? বোনেদের মধ্যে কেউ এসে থাকলে তো তার ঘরে বসবার কথা নয়। সুমিত্রাকে দেখে অজয় একেবারে অবাক হয়ে গেল।

"আরে আপনি ! কি সৌভাগ্য ! তারপর কি খবর ?"

"অসুখ শুনে দেখতে এলাম। কিন্তু দেখলাম যে, ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?" সুমিত্রা হাসতে লাগল।

কি জানি কেন সুমিত্রার শেষের কথাটা অজয়ের ভাল লাগল না। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ও, মিত্রসাহেব পাঠিয়েছেন বুঝি ?"

সুমিত্রার মুখখানা কালো হয়ে গেল। সে শুধু বলল, "বোধহয় তাই।"

রমা বলে উঠল, "যাও, যাও দেখা আছে। আজ ছয়দিন ধরে অফিস যাচ্ছ না কেউ কি একবার খবরটা নিতে এলো। দিদি তো তবু এসেছে। তবুও তো তুমি মেয়েদের দেখতে পার না। চল দিদি, আমরা ও ঘরে গিয়ে গল্প করি।"

অজয় অবাক হয়ে গেল ; "সে কিরে! 'দিদি', 'চল', এরি মধ্যে এত ভাব?"

"তা হবে না? তোমার মত এত কূটবুদ্ধির লোক তো আর সবাই নয়।"

"আচ্ছা তুই যা, একটু চায়ের ব্যবস্থা কর, বড্ড খিদে পেয়েছে।"

রমা চলে গেল।

ঘরে একখানাই চেয়ার ছিল। সুমিত্রা তাতে বসে ছিল। অজয় বিছানায় গিয়ে বসল।

"কতক্ষণ এসেছেন?"

"এই ঘণ্টাখানেক।"

আর কোন কথা নেই। অজয়ের মনে হলো সুমিত্রা যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

"রাগ করলেন নাকি, মিস্ দত্ত?"

"এই যাঃ, রাগ করবার কি আছে?"

"তবুও।"

"বাঃ, রাগ করব কেন? আর দেখুন অজয়বাবু, আপনি আমাকে মিস্ দত্ত বলে ডাকবেন না? ভাল লাগে না

'কেন বলুন তো?"

"কেন, আমি কি মেমসাহেব?"

"অফিসে তো সবাই তাই বলে।"

"বলুকগে। ইচ্ছে হয় আপনিও অফিসে তাই বলবেন। কিন্তু এটা তো আর আপনার অফিস নয়।"

"তবে কি বলব ?"

"কেন ? আমার কি নাম নেই ?"

"আপনাদেরকে নিয়ে ঐ ত' মুস্কিল। বিলিতি কায়দায় ডাকতে রুচিতে বাধে আবার নাম ধরে ডাকিই বা কি করে ? বাবুটাবু গোছের একটা কিছু জুড়তে না পারলে ভীষণ অসুবিধে হয়—।"

"লেজুড় আপনাদের জন্যেই থাক। আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।"

"কিন্তু একটা অসুবিধে আছে যে! কর্ত্তা দ্বিতীয় পুরুষ হলে ক্রিয়াও যে দ্বিতীয় পুরুষের দিতে হয় ?"

"আমি কি বলছি যে তৃতীয় পুরুষের দিতে হয় ?"

"বেশ, তাই হবে।"

"তারপর, অফিসের খবর কি ?"

"অনেক খবর। তা' বলতেই এলাম।"

"আচ্ছা, সে পরে হবে। দেখে আসি চায়ের কদ্দূর !"

"হচ্ছে হোক না, এত তাড়াতাড়ি কিসের ? তারপর, বলুন আপনি কেমন আছেন ?"

"এখন ভাল হয়ে গিয়েছি। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল।"

"সোমবার যাচ্ছেন তো ?"

"তাই তো ইচ্ছে করছি।"

আপাততঃ আর কোন কথা না থাকায় কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

তারপর সুমিত্রাই প্রথম কথা আরম্ভ করল, "আপনার ঘরে তো অনেক বই।"

"বই মাত্রই। পড়াশুনা অনেকদিন ইতি হয়ে গিয়েছে।"

"কয়েকটা বেশ ইণ্টারেষ্টিং বই দেখলাম।"

"কি?"

"জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকখানা বই।"

"ও কিছু নয়।" অজয়ের কেমন লজ্জা করতে লাগল।

রমা চা নিয়ে এলো। চা-পানের পর আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে পর সুমিত্রা উঠে পড়ল।

"চলুন, আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

"চলুন।" রমাকে তাদের বাড়িতে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুমিত্রা উঠে পড়ল।

রাস্তায় নেমে এসে অজয় বলল, "অফিসের কি কথা বলবেন বলেছিলেন।"

"তা' এত তাড়াতাড়ি হবে না।"

"বেশ, পরে এক সময়ে হবে। আর অফিসের কথা যত কম আলোচনা করা যায় ততই ভাল।"

"কিন্তু দরকারী কথা।"

"আচ্ছা, হবে।"

বাস ষ্ট্যাণ্ডে তারা এসে পড়ল। বাসে উঠতে উঠতে সুমিত্রা বলল, "আবার কবে আসব ?"

"যেদিন খুসী। এলে খুব আনন্দিত হব।"

বাসে উঠেই সুমিত্রা ভাবতে লাগল যে আজই সব কথা অজয়কে খুলে বলা উচিত ছিল। বাড়ি যেতে যেতেই সে ঠিক করে ফেলল, কাল দুপুরেই আবার আসতে হবে।

পরের দিন অপ্রত্যাশিতভাবে সুমিত্রাকে আসতে দেখে অজয় ভারি খুসী হলো।

"আসুন, আসুন মিস্ দত্ত। সত্যিই আজ আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে আপনি আমাকে বন্ধু বলে মনে করে থাকেন।"

"শুনে খুসী হলাম। কিন্তু আপনিও কি তাই মনে করেন ?"

"বাঃ, কেন নয় ?"

"তাহলে, আবার মিস্ দত্ত ?"

"ওঃ sorry !"

"দেখুন অফিসের কথাগুলো আপনাকে না বলে শান্তি পাচ্ছিনে।"

"বেশ তো, বল না।" বলেই অজয় হেসে ফেলল।

সুমিত্রা মিত্রসাহেবের সঙ্গে ক্লাব গমনের ইতিহাস আনুপূর্বিক বর্ণনা করল। শুনে অজয় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মিত্রসাহেব কি চরিত্রের লোক তা সে জানত;

কিন্তু তা বলে এতটা তার ধারণায় ছিল না। তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

কতক্ষণ নীরব থাকার পর সুমিত্রা বলল, "আচ্ছা, বলুন তো আমি কি করি।"

"দেখ সুমিত্রা, এর জবাব দেওয়া মুস্কিল। তবে চাকরী যখন করতেই হবে তখন সহ্য করা ছাড়া উপায় কি ?"

"কিন্তু বিপদও তো কোনদিন হতে পারে ?"

"তা তো পারেই।"

"তবে।"

"ভয় পাচ্ছ কেন ? দেখ না কি দাঁড়ায়।" অজয় এই প্রসঙ্গ এড়াতে চাইল।

হঠাৎ সুমিত্রা বলে উঠল, "আচ্ছা আপনি তো জ্যোতিষ জানেন, দেখুন তো আমার অদৃষ্টে কি আছে ?" বলেই হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

"দূর, কিসের জ্যোতিষ জানি ?"

"থাক, বিনয় করতে হবে না। দেখে দেবেন কিনা বলুন ?"

"আচ্ছা দাও।"

সুমিত্রার সুগোল, মসৃণ হাতখানা অজয় টেনে নিল। হস্তীদন্তশুভ্র সুমিত্রার কোমল কর অজয়ের বলিষ্ঠ হাতে যেন আশ্রয় খুঁজে পেল। উভয়েরই শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল।

"ভাল মন্দ যা দেখবেন সব কিন্তু বলতে হবে।"

"আচ্ছা, দেখছি।"

অজয় ঘাড় নীচু করে সুমিত্রার হাত দেখতে লাগল আর সুমিত্রা পলকহীন নেত্রে অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখতে দেখতে আধঘণ্টা কেটে গেল। অজয় মুখ তুলে চাইল। সুমিত্রার প্রসন্ন মুখখানার দিকে তাকাতেই তার বুক ভরে উঠল। সুমিত্রা বলল, "বাঃ কিছুই বলছেন না কেন ?"

"বলছি, বলছি, খুব ভাল হাত।"

"এসব কথায় আমি ভুলছিনে। সব খুলে বলতে হবে।"

"বলব। তারপর অফিসের আর কি খবর বল।"

"আর কি খবর থাকবে ? চারটে বাজে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। আপনার এখান থেকে যেতেও তো প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে।"

"চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"বেশ, বেশ চলুন।"

দুজনেই বেরিয়ে পড়ল। এসপ্লানেডের কাছাকাছি আসতেই অজয় বলল, "চল না সুমিত্রা গঙ্গার ধারে একটু ঘুরে আসি।"

"চলুন।"

গঙ্গার ধারে গাছতলায় এসে দুজনে বসল। তারপর তাদের মধ্যে যে সব কথাবার্ত্তা হলো তার কোন ধারাবাহিক

বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনায়াসেই তা অনুমান করে নিতে পারবেন।

অজয়ের হঠাৎ মনে হতে লাগল সুমিত্রার এত সামান্যতম, তুচ্ছতম কথাও তার এত ভাল লাগে কেন? ইতিপূর্ব্বে কোন মেয়ের সংস্পর্শে সে আসে নি এমন নয়, কোন কোন মেয়ের ঘনসান্নিধ্যও তার ভাগ্যে ঘটেছে। কিন্তু এত তীব্র আকর্ষণ, এত মধুর অনুভূতি কোন দিন তার হয় নি।

সুমিত্রার হাসি, চুলের স্পর্শ, ছেলেমানুষি কথাবার্ত্তা সব কিছুই তার কাছে অপূর্ব্ব সুষমা নিয়ে ধরা দিল।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। সুমিত্রা বলল, "চলুন এবার বাড়ি ফিরতে হবে।"

"চল।" অজয় উঠে দাঁড়াল এবং একখানা হাত বাড়িয়ে সুমিত্রাকে টেনে তুলল।

সারারাত্রি অজয় শুধু সুমিত্রার কথাই ভাবল। সুমিত্রার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত ছবি বারেবারে তার মানসপটে ভেসে বেড়াতে লাগল। নিখুঁত চিত্রশিল্পী যদি সুমিত্রাকে দেখেন তবে নিশ্চয়ই অনেক খুঁত ধরতে পারবেন। ঠোঁট দুটো একটু পুরু, দন্তপংক্তিও খুব সুবিন্যস্ত নয়, গাল দুটো একটু ফোলা ফোলা, কপালটাও হয়তো একটু ছোট। তা হোকগে, অজয়ের কাছে তাই অপরূপ মনে হয়, বিশেষ করে

অভিমানে গালছু'টো যখন আরো ফুলে ওঠে, তখন অজয়ের ইচ্ছে করে······যাক। যাকগে, একি চিন্তা! ছিঃ!

পরদিন খুব ভোরে অজয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেতনার রাজ্যে আসতেই সুমিত্রার কথা তার মনে হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তার প্রাণ মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে অকস্মাৎ যেন তরঙ্গের আবির্ভাব হলো। যে প্রশান্ত বারিধি এতদিন অনুদ্বেলিত ছিল আজ কিসের আকর্ষণে সে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল? কোন শিলাতটে প্রতিহত হয়ে সে তার গতি সম্বরণ করবে? তার গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে অজয় চমকিত হয়ে উঠল। আঠাশ বছরের অবরুদ্ধ যৌবন আজ যেন বাধাবন্ধহীন হয়ে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। অজয় বিস্মিত হলো, বিচলিত হলো!

দাঁত মাজতে মাজতে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। পৃথিবী যেন তার কাছে আজ এক নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিল। হঠাৎ পাশের বাড়ির এক শয়নকক্ষের দিকে তার নজর পড়ল। একটি তরুণী বধূ তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অসংবৃত বসনে অজয়ের কাছে এক অপরূপ রূপে সে দেখা দিল। অন্য যে কোন দিন হলে অজয় ঘরের ভিতর চলে যেত। কিন্তু আজ যেন কেউ তাকে এখানে থাকতে বাধ্য করছে। তার নড়বার ক্ষমতা নেই। এমন সময় বোন ডাকল "দাদা, তাড়াতাড়ি মুখ ধোও, চা হয়ে গিয়েছে।"

অজয় সম্বিৎ ফিরে পেল। বেত্রাহত কুকুরের মত সে পালিয়ে গেল।

চা খেয়েই রেশনের থলি হাতে সে বেরিয়ে পড়ল। গিয়ে দেখে যথারীতি লম্বা লাইন হয়েছে। মহাবিরক্তভাবে সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই তার সে বিরক্তি ভাব কোথায় চলে গেল। দাঁড়িয়ে থাকতে যেন তার ভালই লাগছিল। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, "ও মশায়, একটু তাড়াতাড়ি করুন না, ন'টা যে বাজে।"

অজয় চমকে উঠল। সে কি! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, অথচ মনে হচ্ছে যেন পাঁচ মিনিট। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে দেখল যে, নিতান্ত অজ্ঞাতে তার চোখদুটি অদূরে মেয়েদের লাইনের একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ের বক্ষস্থলের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে। ছিঃ, আমি এত নীচে নেমে গিয়েছি। অজয় আবার কশাহত হল। কিন্তু কেন তার মন আজ উতলা হয়ে উঠল? কি এর কারণ?

বাড়ি এসে অজয় দেখল অফিসের আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি এক খাব্‌লা তেল মাথায় দিয়ে গামছাটা টেনে নিয়ে সে কলতলার দিকে ছুটল। কলে কে যেন তখন চান করছে, তাকে একটু অপেক্ষা করতে হলো। মিনিট কয়েক বাদেই একটি বৌ চান করে বেরুল। ভিজে কাপড়টা তার সর্ব্বাঙ্গে লেপটে রয়েছে। উরুদ্বয়, নিতম্ব, স্তনচূড় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সরিকানা কলে এরকম দৃশ্য

হামেশাই হয় এবং সত্যি বলতে কি এসব ব্যাপার অজয়ের নজরেই কোনদিন আসে নি। কিন্তু এই একটা অতি সাধারণ দৃশ্য একেবারে তার বুকে গিয়ে আঘাত হানল। তার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। 'অফিসের বেলা নেই' একথা আর তার মনে রইল না। একদৃষ্টে হা করে সে বৌটির গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। উপর থেকে আবার রমার ডাকে তার চমক ভাঙ্গল, "দাদা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তাড়াতাড়ি কর, দশটা যে বাজে।"

"এই যে, হলো বলে।"

খাওয়া শেষ করে কোনমতে ছুটে গিয়ে সে বাস্ ধরল। সৌভাগ্যক্রমে কোণের দিকে একটা জায়গাও জুটে গেল। আজ তার মনের যে অবস্থা, দাঁড়িয়ে যেতে রীতিমত অস্বস্তি লাগত। বসে বসে অজয় তার মনের অস্থির গতির কথাই চিন্তা করতে লাগল। কেন আজ এমন হলো?

এমনি সময় বই হাতে একটি কলেজের ছাত্রী ঠিক তার সামনের সীটে এসে বসল। প্রায়ই এমন হয় কিন্তু আজ কে যেন চুম্বকের মত অজয়ের দৃষ্টিকে মেয়েটির দিকে টেনে নিয়ে এলো। মেয়েটি দেখতে বেশ চমৎকার! টান করে খোঁপাটি বাঁধা রয়েছে। খোঁপার নীচে বেশ খানিকটা দূরে ব্লাউজ। উন্মুক্ত শুভ্র গ্রীবাদেশ অজয়ের মনে এক অসহনীয় মোহের সৃষ্টি করল। অকস্মাৎ তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল; বুকের ভেতর তোলপাড়

আরম্ভ হলো। বুক থেকে কি যেন একটা উঠে এসে গলায় ঠেকতে লাগল। আকণ্ঠ পিপাসায় মনে হলো সে যেন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। আস্তে আস্তে সে মাথাটা বাসের রেলিঙে রাখল। ক্লান্তিতে তার চোখদুটি বুঁজে এলো। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে মেয়েটি নেমে গেল। অজয় স্বস্তি বোধ করল।

অফিসে বেশ ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে অজয় কাজে মন দিল। মনের উদ্দাম গতি বোধহয় এবার প্রশমিত হবে। এমন সময় মিত্রসাহেবের ঘর থেকে ডাক এলো।

সুমিত্রা একাকী বসে আছে। মিত্রসাহেব নেই।

"কি ব্যাপার, সাহেব কোথায় ?"

"তিনি এসেই বেরিয়ে গেছেন। এই চিঠিটা দিয়ে গেলেন, টাইপ করতে হবে ;"

"তা' কর।"

"চালাকী হচ্ছে বুঝি ?"

"চালাকী কিসের ? তোমার কাজ বরাবরই আমি করব ?"

"কেন ? তাতে আপত্তি কি ?"

"আহা, কি আব্দার !"

"কেন, আমার কাজ করতে আপনার ভাল লাগে না ?"

"বেশ, করে দিচ্ছি। কিন্তু মাসকাবারে অর্দ্ধেক মাইনে আমাকে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু।" অজয়ের মনে আবার রঙের খেলা আরম্ভ হলো।

"অর্দ্ধেক কেন ! পুরোই দিতে পারি।"

"তাই নাকি ? তাহলে······" অজয় আর কথা বলতে পারল না।

সুমিত্রা একখানি আশমানী রঙের শাড়ী পরে এসেছিল। গৌর তনুর সঙ্গে আশমানী রঙ মিলে যেন রূপের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিল। ব্রেসিয়ার আবদ্ধ সুউচ্চ বক্ষস্থলে সরু হারের লকেটটি চিক্‌চিক্ করে অজয়ের চোখকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। সে আর স্থির থাকতে পারল না। এক মুহূর্ত্তের জন্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চোখ থেকে সরে গেল। সে হঠাৎ সুমিত্রার হারের লকেটটিতে হাত রেখে বলে উঠল, "সুমিত্রা, তোমাকে আজ আমার অপরূপ মনে হচ্ছে।"

সুমিত্রা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল! অজয়ের চোখে চোখ রেখে বলল, "আপনার আজ কি হয়েছে অজয়বাবু ? শরীরটা কি ভাল নেই ?"

অজয়ের সর্ব্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে সে ছিট্‌কে সরে পড়ল। পরক্ষণেই কাতর দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বলল, "না সুমিত্রা, শরীরটা আজ খুব খারাপ লাগছে। ভয়ানক মাথা ধরেছে।"

"তা হলে বাড়ি চলে যান।"

"সাহেব তো নেই, কাকে বলে যাব ?

"ঠিক আছে, আমি সাহেবকে বলবখ'ন। আপনি চলে যান।"

অজয় চলে যাচ্ছিল। সুমিত্রা ডেকে বলল, "শরীর ভাল না থাকলে কালও আসবার দরকার নেই। আজই বা কেন যে এলেন বুঝতে পারলাম না। আরও কয়েকদিন ছুটি নিলেই হত।"

"তাই নেব।"

অফিস থেকে বেরিয়ে অজয় ভাবল বাড়ি গিয়েই বা এখন কি হবে? অসুখ যে কি সে তো জানে? মিছিমিছি সবাই ভাববে। তার চেয়ে ঘুরে ফিরে মনটাকে ঠাণ্ডা করে বাড়ি গেলেই হবে। হাঁটতে হাঁটতে অজয় এসপ্লানেডের মোড়ে এলো। বইয়ের ষ্টলটা একটু দেখা যাক। আবার সে বিপদ ডেকে আনল।

ষ্টলটার যেদিকে প্রায় নগ্ন চিত্রবিশিষ্ট বইগুলো রয়েছে তার নজর সেদিকে চলে গেল। এক একখানা ম্যাগাজিন হাতে করে সে অপলক দৃষ্টিতে ছবিগুলো দেখতে লাগল। কি সে গভীর আকর্ষণ! এসপ্লানেডের প্রচণ্ড হট্টগোল তার কানেই ঢুকল না। সমস্ত পৃথিবী যেন তার চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছে।

এমন সময় বইওয়ালা বিদ্রূপ করে বলল, "বাবু কিনে দেখুন। বিনা পয়সায় কত আর মজা পাবেন?"

চোরের মত সে পালিয়ে গেল। কোথায় যাওয়া যায়? এমন সময় তার দৃষ্টি সামনের একটা চিত্রগৃহের প্রতি আকৃষ্ট হলো। বিরাট এক প্রাচীর চিত্র টানানো রয়েছে। চিত্রে

দেখা যাচ্ছে অর্দ্ধনগ্ন সুন্দরীরা জলে ঝাঁপ দেবার ভঙ্গীতে দেহ এলিয়ে রেখেছে।

আবার হাতছানি! আবার সেই বুক তোলপাড় করা অনুভূতি। অজয় নিজেকে হারিয়ে ফেলল। দ্রুতপদে সে এগিয়ে গেল। ম্যাটিনী শো'য়ের একখানা টিকিট কিনে চিত্রগৃহে সে ঢুকে গেল। সাংঘাতিক সে ছবি। সমস্ত ছবিটাই স্নানরতা একদল তরুণীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। নীল সমুদ্রে ছোট্ট একটি দ্বীপ। তাতে রয়েছে স্বচ্ছ নীল জলপূর্ণ এক হ্রদ। চারদিকে নারকেলকুঞ্জ। আমেরিকার বিখ্যাত সুন্দরীরা নগ্ন দেহসৌষ্ঠব বিস্তারিত করে হ্রদের জল বিমথিত করছে। পাতলা সামান্য যে একটু আবরণ তাদের দেহে আছে তাতে আকর্ষণ বেড়েছে। সেই স্বচ্ছ দেহাবরণ ভিজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে, ফলে কিছুই আর অদৃশ্য থাকছে না।

উল্লাসে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ মত্ত হয়ে উঠেছে। ঘনঘন করতালি ও শিস্ দেওয়ার আওয়াজে দর্শকমন যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা' পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহেও অজয় ঘেমে উঠল। অসহ্য ক্লান্তি ও অচিন্তনীয় এক শিহরণে সে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলল। কোচে হেলান দিয়ে সে চোখ দু'টি বুজে রইল।

অকস্মাৎ ঘনঘন করতালিতে সে চেতনার রাজ্যে ফিরে এলো। দেখল জলের নীচে নায়ক বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে

নায়িকাকে জড়িয়ে ধরেছে এবং তীব্র চুম্বনে তাকে অস্থির করে তুলছে। আর এক মুহূর্ত্তও অজয় বসে থাকতে পারল না। ছুটে সে বাইরে চলে এলো। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

মাঠে খানিকটা বেড়িয়ে গেলে ক্লান্ত মন হয়তো সজীব হবে। কিছুটা এগোতেই অজয় বহুজনের ভীড় দেখতে পেল। বোধহয় খেলা হচ্ছে। ভালই হলো। খেলা দেখলে মন থেকে এই কুচিন্তা যাবে।

কিন্তু আবার বিপদের মধ্যে এসে পড়ল অজয়। একদল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে হকি খেলছে। বলা বাহুল্য, খেলার সামান্য পোষাকে তাদের দেহের প্রায় কিছুই ঢাকা পড়ছিল না। উন্মুক্ত উরুদেশ, বিশেষ করে তারা যখন ছুটছিল তখন তাদের দোলায়মান বক্ষস্থলের প্রতি নজর পড়লে যে কোন লোকেরই বিচলিত হবার কথা। আজকের মন নিয়ে অজয় তো হবেই। অজয় সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে দেখল যে, দর্শক-বৃন্দের চোখ মোটেই খেলার দিকে নিবদ্ধ নহে। অজয় জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিল। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, চলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। খানিকটা এগিয়েই গাছতলায় একটা বেঞ্চিতে সে সটান শুয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়ে থাকার পর অজয় তার মনের বিচিত্র গতির কথা ভাবতে লাগল। নিষ্পিষ্ট যৌবন বোধহয় আজ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে এসেছে। প্রকৃতির আমন্ত্রণকে বারেবারে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সব কিছু

ভাসিয়ে দিয়ে একদিন সে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেই। দূরাগত সমুদ্রের গর্জ্জনের মত এখনও অজয় তার আহ্বান শুনতে পাচ্ছে। অজয় এতদিন বিশ্বাস করত না যে, বহু বৎসরের সংযম ও নিষ্ঠা একদিনে ভেঙ্গে যেতে পারে। আজ মনে হলো সবই সম্ভব। বিচিত্র এই মানুষের মন, বিচিত্র তার লীলাচপল গতিবিধি!

রাত অনেক হয়ে গিয়েছে, অজয় বাড়ি যাবার বাস্ ধরল। বাগবাজারের মোড়ে এসে হঠাৎ খেয়াল হলো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে। বাস্ থেকে সে নেমে পড়ল। রাস্তায় লোকচলাচল অনেকটা কমে এসেছে। তাড়াতাড়ি সে পা চালাল।

হঠাৎ অদূরে একটা গ্যাস লাইটের নীচে তার দৃষ্টি পড়ল। এক পণ্যা নারী দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে আলোর নীচে তাকে অজয়ের ভারি সুন্দর মনে হলো। সমস্ত ভদ্রতার ও নীতিবোধের আবরণ খসে গেল। সমস্ত শিরা-উপশিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত সজোরে প্রবাহিত হতে লাগল। অজয় এক পা, দু'পা করে এগোতে লাগল। মনকে সে প্রবোধ দিল, "ওর কাছে তো আর আমি যাচ্ছিনে, একবার পাশ দিয়ে গেলে দোষ কি?" মেয়েটির একেবারে ধারে এসে সে মুহূর্ত্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়াল। মোহময় দৃষ্টিতে মেয়েটি অজয়কে বিদ্ধ করতে লাগল। সমস্ত কলকাতা নগরী অজয়ের মাথার সামনে ঘুরতে লাগল। অসহ্য কষ্টে নিজেকে

সংবরণ করে যেই সে পা বাড়াতে যাবে এমনি সময় মেয়েটি একগাল হেসে বলল, "আসুন না বাবু।"

পাউডারের উগ্র প্রলেপ মেয়েটির মুখের রুক্ষতাকে ঢাকতে পারেনি। কোটরগত চক্ষু, নিতান্ত নির্লজ্জ দৃষ্টি, সর্ব্বোপরি এই খোলাখুলি আহ্বান—অজয়ের গলা কেমন চেপে ধরল। ছিঃ, এত কুৎসিত!

ফেনায়িত দুগ্ধে জল ঢেলে দিলে যে অবস্থা হয় অজয়ের তাই হলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। তার সারাদিনের মোহবিলাস একনিমেষের কদর্য্যতায় ভেসে গেল।

হঠাৎ অজয়ের মায়ের কথা মনে হলো। মা বোধহয় বারান্দায় বসে আছেন তারই প্রতীক্ষায়।

অজয় ছুটতে ছুটতে বাসে গিয়ে উঠল।

পরের দিন অনেক বেলায় অজয়ের ঘুম ভাঙ্গল। অনেকক্ষণ একটানা ঘুমানোর ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর হলো। তবুও সে ঠিক করে ফেলল যে আজ অফিসে যাবে না। অফিসে গেলেই সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হবে—একথা ভাবতেই অজয়ের ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। না জানি সুমিত্রা কি ভাবছে? অন্ততঃ কিছুদিন সুমিত্রার সামনে না পড়াই ভাল।

অফিসে এসে সুমিত্রা এগারোটা পর্য্যন্ত অজয়ের অপেক্ষা করল। কি হলো? আবার জ্বরটর হয় নি তো? আজও মিত্রসাহেব বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে, চারটে পাঁচটার সময় তিনি একবার আসবেন। সুমিত্রা বলল, "আপনি চলে গেলে আমার তো বিশেষ কাজ থাকবে না। আমার একটু দরকার ছিল।"

"তা বেশ তো। ঘুরে আসুন গিয়ে।"

মিত্রসাহেব চলে যাওয়ার মিনিট দশেক পরে সুমিত্রাও বেরিয়ে গেল।

অজয় শুয়ে শুয়ে পড়ছিল। খানিকটা ঘুমুবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ঘুম হলো না। হঠাৎ সুমিত্রাকে দেখে সে একেবারে লাফিয়ে উঠল। "আরে, তুমি!"

"কেন, অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছে কি?"

"কিন্তু তুমি কি করে এলে!"

"যা করে সবাই আসে। তা যাক, কেমন আছেন?"

"ভাল।"

"তবে অফিসে যান নি কেন?"

এবার অজয়ের মাথাটা নীচু হয়ে এলো। সে আড়চোখে সুমিত্রার দিকে তাকাল। তারপর এক সময়ে খুব কাচুমাচু করে বলল, "সুমিত্রা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

"হঠাৎ ক্ষমা করতে যাব কেন? কি হলো?"

"কাল মাথাটা ঠিক ছিল না, তাই......" অজয় আমতা আমতা করতে লাগল।

"তা যাকগে। আজ ঠিক আছে তো?"

অজয় বোকার মত মুখ করে হেসে ফেলল।

"চলুন, ঘুরে আসি।" সুমিত্রা প্রস্তাব করল।

"কোথায়?"

"যেখানেই হোক।"

"চল।"

ছ'জনেই বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস্ পর্য্যন্ত সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে অজয়ের খুব লজ্জা

করতে লাগল। সবাই তাকিয়ে থাকে; দুয়েকজন মুচকি হাসেও। চেনা কেউ সামনে পড়লে অজয়ের অত্যন্ত অস্বস্তি লাগে। এমনিতে একলা থাকলে চেনা লোকেরা প্রায় কোন কথাই বলে না। কিন্তু সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দেখলেই কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করবার আগ্রহটা তাদের বেড়ে যায়। বাসেও তাই। সেজন্যে অজয় এমন একটা ভাব দেখায় যেন সুমিত্রা তার খুবই নিকট আত্মীয়। সবাই যেন মনে করে তারা বোধহয় ভাইবোন। সুমিত্রার সঙ্গে তখন সে এমন ভাবে কথা বলে যে, সে তুমি বলছে কি তুই বলছে ধরবার উপায় থাকে না। আজ বেরিয়েই সুমিত্রাকে সে বলল, "দেখ সুমিত্রা, রাস্তায় বা বাসে-ট্রামে তুমি আমাকে আপনি বলো না।"

"তবে কি বলব?"

"তুমি বলবে।"

"শুধু রাস্তাঘাটে?" সুমিত্রা বাঁকা চোখে অজয়ের দিকে তাকাল।

"না, না। সব সময়ই তুমি বলতে পার।" অজয় খুব উৎসাহিত বোধ করল।

"আচ্ছা, দেখা যাবে। তা হঠাৎ এ কথা কেন?"

অজয় তার লজ্জার কারণ বিবৃত করল। সুমিত্রা তা শুনে হেসেই অস্থির, "বাঃ, তাতে আমাদের কি এসে যায়! যার ইচ্ছে হয় তাকিয়ে থাকুক না।"

"না, আমার ভারি অস্বস্তি লাগে। দেখেছ তো যেখানেই যাই না কেন লোকগুলো কেমন অসভ্যের মত তাকিয়ে থাকে। দুয়েকটা যে মন্তব্যও না করে এমন নয়।"

"তা করুকগে। সেই যে.........চীৎকার করুক।"

"তাতো বুঝলাম, তবুও আমার বিশ্রী লাগে। আচ্ছা কেন ওরা এমন করে বল তো।"

"তা করবে না?"

"কেন করবে?"

"বুঝতে পারেন না?"

"ঈর্ষ্যা?"

"তা ছাড়া আর কি? দেখেন না অফিসের মেয়েদের, শুধু অফিসের মেয়েদেরই, বা কেন যে সব মেয়েরা বাইরে বেরোয় তাদের কি বদনাম।"

"কেন বল তো?"

"কেন আর কি? আঙ্গুর ফল টক্।"

"যাকগে, কোথায় যাবে? চল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের মাঠে গিয়ে বসি।"

"তাই চলুন।"

"আবার 'চলুন'।" অজয় ধমকে উঠল।

"হবে। হঠাৎ অভ্যেস বদলাব কি করে? সময়মত ঠিক হয়ে যাবে।" হাসতে হাসতে সুমিত্রা বলল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের একটা পুকুরের ধারে গাছ-

তলায় দু'জনে বসল। সামনেই লাল টক্‌টকে রাশি রাশি কলা-বতী ফুল ফুটে আছে। তার কাছেই পুকুর। ঈষৎ হাওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ উঠছে। চারপাশের গাড়ীর বিচিত্র শব্দ মিলে যেন এক সুরে পরিণত হয়েছে। শুধু একটা গোঁ...ও...ও আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল। সুমিত্রাই প্রথম নীরবতা ভাঙ্গল, "আচ্ছা অজয়বাবু, মিত্রসাহেবের অফিস কদ্দিন চলবে বলুন তো?"

"তা' চলবে না কেন?"

"যে রকম কীর্ত্তি করে যাচ্ছেন, একদিন ধরা পড়বেন না?"

"কেন ধরা পড়বে? সব উপরওয়ালাদের সঙ্গে খাতির।"

"তা আপনারা ধরিয়ে দেন না কেন?"

"বাঃ, বেশ বলছ তো? তারপর সব যাব কোথায়?"

"ও, এই ভয়?" সুমিত্রা চুপ করে গেল।

অজয় বলতে লাগল, "দেখ সুমিত্রা, প্রথম প্রথম আমিও ভাবতাম এই অবিচার সহ্য করব না। সকলে একসঙ্গে মিলে আঘাত হানব। এখন দেখছি তা' হবার নয়। আজ চাকরী গেলে কাল কি হবে এ ভয়ে সবাই অস্থির। আর তা খুব স্বাভাবিকও। তাই শেষ পর্য্যন্ত চুপ করে সব সহ্য করতে হয়। আর সহ্য করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন উৎপীড়নটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।"

"আপনার ওখানে কাজ করতে ভাল লাগে?"

"মোটেই না। কিন্তু কি করব? উপায় কি বল?"

"আপনার কি ভাল লাগে ?"

"আরে। তুমি যে হাসালে দেখছি। কি ভাল লাগে আর না লাগে এ যুগে সে ভাববিলাসের স্থান আছে নাকি ?"

"তা হোক গে। শুনিই না ?"

একটু চুপ থেকে অজয় বলল, "দেখ সুমিত্রা, জীবন সম্পর্কে স্বপ্ন কোনদিনই আমি দেখি নি। জীবনে খুব বেশী করে প্রয়োজনও আমি সৃষ্টি করি নি। শুনতে অনেকটা আপ্তবাক্যের মত শোনালেও তোমাকে বলতে বাধা নেই যে, অর্থের প্রতি আমার কোন লালসা নেই। তবে উঞ্ছবৃত্তিও করতে পারিনে। এমন একটা কাজ পেলেই আমি সন্তুষ্ট যার বিনিময়ে খাওয়া পরাটা চলে যায়। সকাল বিকাল ছাত্র পড়ানো অসহ্য হয়ে উঠেছে। মাইনে যা পাই তাতে দশদিনও চলে না। এক পয়সা না বাঁচুক অন্ততঃ তিরিশ দিন চলে যায় এমন পারিশ্রমিক যদি পাই তবেই আমি সন্তুষ্ট। বাড়িও চাইনে, গাড়ীও চাইনে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও চাইনে।"

"সকাল বিকেল অবসর পেলে কি করবেন ?'

"পড়ব, খালি পড়ব। ওঃ! সুমিত্রা কতকাল পড়তে পাইনে। মাঠে একটু বেড়াতে যেতে পারিনে। কতদিন, কতকাল সোনালী সন্ধ্যার মুখ দেখতে পাইনে।"

"একটা বিয়ে করুন, দেখবেন এসব কবিত্ব চলে যাবে ?"

"তাই বটে! তুমি এতক্ষণে রোগ ধরলে।" অজয় হেসে ফেলল।

"ঠিকই ধরেছি।"

"আচ্ছা সুমিত্রা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেসা করব ?"

"এত ভূমিকা কেন ? করলেই হয় ?"

"তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না ?"

"মেয়েদের এসব কথার জবাব দিতে নেই ?"

"ওঃ তাও তো বটে! সত্যি সুমিত্রা, তোমার কথা ভাবলে আমার অনেক সময় কষ্ট হয়।"

"তাই নাকি! কেন বলুন তো ?"

"দেখ তোমার মত bright মেয়ে ক'টা আছে ? ঠিক জায়গায় পড়লে ক'টি মেয়ে তোমার মত সুগৃহিণী হতে পারে ? অথচ তোমাকেই চব্বিশ ঘণ্টা এক বিরাট বোঝা ঘাড়ে করে বেড়াতে হচ্ছে।"

"আপনার যুক্তি ঠিক নয়। ভগবান ঘাড় বুঝেই বোঝা দেন। আমি না হয়ে একটি আদুরে তুলতুলে মেয়ে হলে আমার বাবা, ভাই-বোনের কি অবস্থা হত বলুন তো ? আর বড়লোকের স্ত্রী হতে পারলেই যে, সব মেয়ে আনন্দে গদগদ হয়ে যাবে এমন ধারণা রাখেন কেন ?'

"হয় তো তা-ই। তবুও তোমার জন্যে…"

"থাকগে, আমার জন্যে আর ভাবতে হবে না। নিজের জন্যে কিছু একটা ভাল চাকরী যোগাড় করতে পারেন কিনা সেটাই দেখুন তো ?"

"কোথায় পাব ? আর উমেদারি করতে ভাল লাগে

না। যত দিন চলে চলুক। যা হবার তাই হবে।"

"এত অদৃষ্টবাদী হলে চলবে কেন ?"

"না হয়ে আর উপায় কি বল ?"

"উপায় আছে কিনা জানিনে। তবে আপনাকে এটা বলে রাখছি, মিত্র এণ্ড কোম্পানীর চাকরী আপনাকে ছাড়তে হবে।" বেশ জোরের সঙ্গে সুমিত্রা বলল।

"কেন বল তো ? আমি এখানে থাকাতে তোমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে ?"

"দেখুন অজয়বাবু, সব কথার মানে টেনে বার করবেন না ? আপনার ভালর জন্যেই বলছি।"

"হঠাৎ আমার ভাল···"

"কেন আমার জন্য আপনার খুব কষ্ট হয় এই তো বলছিলেন। আর আমি যদি বলি আপনার জন্যেও আমার কষ্ট না হোক ভাবনা হয় তা হলেই সেটা বিদ্রূপের ব্যাপার হয়ে পড়ে, না ?"

অজয় খানিকটা অবাক হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে তার একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল। সুমিত্রা দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুমিত্রা অজয়ের কথা ভাবে। আদর্শে নিষ্ঠাবান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়েও সে কত অসহায়। শুধু এক মুষ্টি অন্নের জন্যে সুবোধ মিত্রের মত একটা পাষণ্ডকেও তার সহ্য করে যেতে হচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে আদর্শবাদ শিথিল হয়ে আসছে আর বিশ্বাস বাড়ছে অদৃষ্টের উপর। হঠাৎ সুমিত্রার মনে হলো অজয়কে টেনে তুলতে হবে। কিন্তু কি করে? কার সাহায্য সে প্রার্থনা করবে? যার সাহায্যেই হোক মিত্র এণ্ড কোম্পানীর অফিস থেকে অজয়কে সরাতেই হবে। সুমিত্রা বেশ ভাল ভাবেই জানে মিত্র এণ্ড কোম্পানীর অফিসে তারও খুব বেশীদিন স্থান হবেনা। তাই এখনই যদি অজয়কে এখান থেকে সরানো না যায় তবে চাকরী ও অজয় দু'দিকই তার যাবে। না, অজয়কে কিছুতেই সে হারাতে পারে না। অজয়কে তার চাই-ই, যে কোন উপায়ে। এক অফিসে থাকলে সুমিত্রার উপর অজয়ের সন্দেহ দিন দিন বেড়েই যাবে। কাজে অকাজে মিত্র সাহেবের সঙ্গে সুমিত্রাকে বেরোতেই হবে। স্বভাবতঃই

অজয় এসব পছন্দ করবে না। অতএব অজয়ের স্থান অন্য জায়গায় করতে হবে। আর সুমিত্রাকেই তা করতে হবে। কারণ হতাশা অজয়কে এমন পেয়ে বসেছে যে নিজের হাত পা নাড়বার তার আর কোন ক্ষমতাই নেই।

সেদিন অফিস যেতে সুমিত্রার দেরী হয়ে গেল। গিয়ে দেখে মিত্রসাহেব তারই অপেক্ষায় বসে আছেন। সুমিত্রাকে দেখেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, "চলুন, চলুন মিস্ দত্ত, আপনারই অপেক্ষায় আমি বসে আছি। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।"

"কোথায় যাবেন ?"

"চলুন না একটু ঘুরে আসবেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে একটু বোম্বে যেতে হবে। এদিককার কাজগুলো আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব, সেরে রাখবেন।"

বেরোবার সময় সুমিত্রা একজন বেয়ারাকে জিজ্ঞেসা করল, "অজয়বাবু এসেছেন ?"

"জী, হ্যাঁ।"

সুমিত্রা বেরিয়ে যাচ্ছিল। বেয়ারাটি জানতে চাইল অজয়বাবুকে কিছু বলতে হবে কিনা। সুমিত্রা কিছুক্ষণ চিন্তা করে "আচ্ছা থাক" বলে চলে গেল।

বহু জায়গায় সুমিত্রা মিত্রসাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াল। তবে আজ আর সে কিছুতেই আশ্চর্য্য বোধ করল না। যাঁদের যাঁদের কাছে তারা গেল তাদের প্রায় প্রত্যেককেই

সুমিত্রা ঐদিন লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের ক্লাবে দেখেছিল। সবাই সুমিত্রাকে যথেষ্ট খাতির করলেন। তবে তাদের প্রত্যেকেরই প্রশংসারত চোখের কোণে সরীসৃপের লোলুপতা সুমিত্রার নজর এড়ায়নি।

আসল রহস্যও সুমিত্রার কাছে পরিষ্কার হলো, এই ব্যবসায়ীর দল যেন একটি একান্নভুক্ত যৌথ পরিবার। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে স্বার্থের সূত্রে আবদ্ধ। যে যাঁর অংশ মত মুনাফা গ্রহণ করে থাকেন। এঁরা অনেকটা কলকাতার চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মতো। প্রাণের দায়ে কোন রোগী চিকিৎসকের কাছে গেলেই তিনি তাকে আস্তে আস্তে জালে আটকান। স্পুটাম, ইউরিন, ব্লাড পরীক্ষা করবার ছলে তিনি তাঁর গোষ্ঠীর প্রত্যেককেই কিছু কিছু পাইয়ে দেন। পরীক্ষা করবার নির্দ্দেশ দিয়েই তিনি পরীক্ষকদের একটা তালিকা রোগীর সামনে মেলে ধরেন। আরও সহস্র পরীক্ষক কলকাতায় থাকতে পারেন কিন্তু এঁদের রিপোর্ট ছাড়া অন্য কারুর রিপোর্টে ডাক্তারবাবুর বিশ্বাস নেই। অতএব রোগীকে বাধ্য হয়েই···। এই ব্যবসায়ীর দলও তাই। এঁরা সকলে মিলে জনসাধারণ নামে রোগীকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বস্বান্ত করতে সাহায্য করে থাকেন।

কিন্তু মজা এই যে প্রগাঢ় সখ্য সূত্রে আবদ্ধ থাকলেও এঁরা একে অন্যকে বিশ্বাস করতে পারে না। সবারই ধারণা লাভের কড়ি অন্যে বুঝি বেশী নিয়ে গেল। তাই সব

সময়ে খেয়াল রাখতে হয়, হুঁসিয়ার থাকতে হয়। মিত্র-সাহেব ঠিক করলেন এবার থেকে লাভের কড়ি গ্রহণ করবার সময় তিনি নিজে না গিয়ে সুমিত্রাকে পাঠাবেন। তিনি নিজে গেলে চক্ষু লজ্জার খাতিরে অনেক কিছু ছেড়ে আসতে হয়। সুমিত্রাকে পাঠালে তা আর হবে না, বরং কিছু কিছু বেশী আদায় হওয়ার সম্ভাবনা। মিত্রসাহেব কাগজপত্র, অন্ধিসন্ধি সব কিছুই সুমিত্রাকে বুঝিয়ে দিলেন এবং এমন ইঙ্গিতও করলেন যে সুমিত্রা ইচ্ছে করলে কিছু কমিশনও গ্রহণ করতে পারে।

সব কিছুই সুমিত্রা খুব স্বাভাবিক মনে গ্রহণ করল। কোন কিছুতেই সে বিস্ময় প্রকাশ করল না। একমাত্র কলুটোলায় একটা ওষুধের কারখানায় গিয়ে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না।

অন্ধকার গলিতে দুর্গের মত একটা বাড়ি। তেতলা সমান উঁচু প্রাচীরে চারদিক ঘেরাও রয়েছে। সরু ফটক, কোন মতে একটা লোক ঢুকতে পারে। সশস্ত্র শান্ত্রী পাহারায় রত। ভেতরে ঢুকেই সুমিত্রার মনে হলো যেন পাষাণপুরীতে এসে সে প্রবেশ করল। বিরাট এক কক্ষে রাশি রাশি শিশি, বোতল ও ওষুধের ফাইল। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক দ্রুত গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। সুমিত্রা অবাক হয়ে দেখতে লাগল। কিছুটা অনুমান ও কিছুটা অনুসন্ধানে সুমিত্রা যা জানল তাতে সে হতবাক হয়ে গেল। পৃথিবীর বিখ্যাত

দুর্ম্মূল্য ওষুধগুলো এখানে তৈরী হয়ে থাকে। নামকরা ওষুধের ফাইলগুলো কোনক্রমে সংগ্রহ করে এমন সুকৌশলে সেগুলোতে ভেজাল দেওয়া হয় যে কারুর সাধ্যি নেই তা' ধরে। লেবেল থেকে আরম্ভ করে ছিপিটা পর্য্যন্ত আসল জিনিষের পরিচয় দিতে থাকে। কৃতী বিজ্ঞানবিদেরা অর্থের বিনিময়ে এই কার্য্যে সহায়তা করে থাকেন। আর শত শত ডিস্‌পেন্সারীর মারফৎ জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে সেগুলো সমগ্র দেশে চালান দেওয়া হয়।

ভাবতে ভাবতে সুমিত্রা শিউরে উঠল। পিতার একমাত্র পুত্র কঠিন টাইফয়েডে হয়তো আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তার এমন একটা দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করলেন যার তিন ফাইলের কমে রোগ সারবে না। আর তিন ফাইলের মূল্যও একশো টাকার বেশী। সারা কলকাতা সহর ঘুরে সে ওষুধ পাওয়া গেল না। তারপর যে ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন তাঁর স্মরণাপন্ন হতে তিনি জানালেন যে কোনক্রমে হয় তো তিনি যোগাড় করে দিতে পারেন তবে অন্ততঃ তিনগুণ মূল্য দিতে হবে। রুগ্ন পুত্রের ছবি মুহুর্মুহু পিতার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সর্ব্বস্ব শেষ করে ওষুধ যোগাড় হলো। বাপ মা একদৃষ্টে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই-বার আর কোন চিন্তা নেই, দু'এক দিনের মধ্যে ভাল হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। কিন্তু হায়! না, না, মিত্রসাহেবদেরকে

সুমিত্রা কোন মতেই ক্ষমা করবে না। যেভাবেই হোক এই পাষণ্ডের দলকে সায়েস্তা করতেই হবে।

প্রায় চারটে বাজে। ঘুরতে ঘুরতে সুমিত্রা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এমন সময় মিত্রসাহেব প্রস্তাব করলেন, "চলুন মিস্ দত্ত, একটু চা খেয়ে আসা যাক।"

"চলুন।"

চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁয় এসে উভয়ে ঢুকলেন। পর্দা ঘেরা ক্ষুদ্র কক্ষে সুমিত্রাকে পাশে নিয়ে মিত্রসাহেব বসলেন। প্রচুর খাওয়ার অর্ডার পেশ হলো।

খেতে খেতে মিত্রসাহেব বেশ সহজ ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন।

"সব দেখলেন তো, মিস্ দত্ত?"

"হ্যাঁ, দেখলাম বই কি!"

"এবার আশা করি সব কিছুই আপনি বুঝতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ, তা' কিছু কিছু পেরেছি।"

"আপনি কি disturbed feel করছেন?"

"না, ঠিক তা' নয়। কেন বলুন তো?"

"না, এমনি জিজ্ঞেসা করছিলাম।"

খানিকক্ষণ পরে মিত্রসাহেবই আবার বললেন, "দেখুন মিস্ দত্ত, এই কাজগুলো যে ভাল নয় তা আমি জানি। আর প্রথম প্রথম যে এগুলো আপনার খুব খারাপ লাগবে তাও

আমি জানি। তবে দুনিয়াতে কি সব কাজই ভাল হচ্ছে? মন্ত্রী মশাইরা কি করছেন?”

মিত্রসাহেবের সঙ্গে তর্ক করতে সুমিত্রার প্রবৃত্তি হলো না। সে শুধু বলল, “তা তো ঠিকই।”

সুমিত্রা দলে ভিড়েছে এ কথা ভেবে মিত্রসাহেব খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি আবেগে সুমিত্রাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বলে উঠলেন, “এই তো চাই।”

সুমিত্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তবে বিচলিত হলো না। অত্যন্ত সহজ ভাবে শুধু বলল, “দেখি আপনাকে কতটা সাহায্য করতে পারি।”

“Never mind, never mind, Miss Datta.” মিত্রসাহেব উৎসাহে একেবারে ফেটে পড়লেন।

আরও অনেকক্ষণ ধরে সুমিত্রাকে মিত্রসাহেবের উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথাবার্ত্তা শুনতে হলো। মিত্রসাহেবের কথার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই যে, কেহ চিরকাল এই পৃথিবীতে থাকতে আসেনি। যতদিন বাঁচবে, ভালভাবে বাঁচাই উচিত। ভালভাবে বাঁচতে গেলে যখন অর্থের প্রয়োজন, আর এই অর্থ যখন সোজাভাবে আসবার উপায় নেই তখন কি করা যাবে? স্রোতের জলে যখন আমরা সবাই ভেসে চলেছি তখন স্রোতকে অগ্রাহ্য করব কি করে? ন্যায়, নীতি চিরকালই ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু তাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তো আর বাঁচা যায় না।

সুমিত্রার কথাই ধরা যাক না কেন। এমন brilliant মেয়ে ক'টা আছে, অথচ তার বাঁচবার জন্যে সমাজ কি ব্যবস্থা করেছে? এই রূপ, যৌবন, বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে কি সুমিত্রা পচে মরবে? কক্ষণো তা' হয় না। কেন হবে? একটু ইচ্ছে করলেই সুমিত্রা রাণীর হালে থাকতে পারে। যে সমাজ ব্যবস্থায় আজ সে না খেতে পেয়ে মরছে সেই সমাজের লোকেরাই তখন তার গুণগান করবে? ভাল মন্দের বিচার হয় টাকা দিয়ে। সুমিত্রার টাকা হোক তখন সে দেখবে ভাল ভাল কথা বলবার কত লোক জুটে যায়। আড়ালে কে কি বলছে তাতে কি আসে যায়?

"সাড়ে পাঁচটা বাজে, চলুন এবার বেরোনো যাক।" সুমিত্রা উঠতে চায়।

"হ্যাঁ, তাই চলুন। আর মনে আছে তো, সামনের সপ্তাহে কলুটোলা যেতে হবে?"

"আছে।"

"মাল তো সব আমি চালান করে দিয়েছি এবার টাকাটা আনতে হবে।"

"তা' আপনিই যান না কেন? এই সব টাকা পয়সার ব্যাপারে··· ।"

"আহা, আপনার যে দেখছি সেই হলো। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে'।"

"তবুও। আমাকে যদি ঠকিয়ে দেয়।"

"আপনাকে ঠকাবে না। আপনার কাছে ঠকে বরং আনন্দ পাবে।"

"তাই নাকি!" সুমিত্রা মিত্রসাহেবের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

"হ্যাঁ, তাই," এই না বলেই মিত্রসাহেব সুমিত্রাকে আবার জড়িয়ে ধরলেন এবং সজোরে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন।

রাগে, অপমানে সুমিত্রার সর্ব্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। তবুও সে আত্মবিস্মৃত হলো না। আস্তে আস্তে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো। সিগারেট টানতে টানতে মিত্রসাহেবও বেরিয়ে এলেন।

"চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, দরকার হবে না। পথে আমার একটু কাজ আছে, আমি বাসেই যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তাহলে চল্লাম, goodbye." মিত্র সাহেব চলে গেলেন।

সুমিত্রা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

কোন মতে আত্মসংবরণ করে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকাতেই সে দেখল অজয় দাঁড়িয়ে আছে। সুমিত্রার বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি অজয়ের পাশে সে গিয়ে দাঁড়াল, "অজয় বাবু?"

অজয় ফিরে তাকাল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মিত্রসাহেব ও সুমিত্রাকে সে দেখেছে।

"ডালহৌসি ট্রাম না ধরে আপনি এস্‌প্লানেডে এলেন?" সুমিত্রা অজয়কে জিজ্ঞেসা করল।

"একটু দরকার ছিল।" কাটা কাটা ভাবে অজয় জবাব দিল।

"চলুন, আমাকে পৌঁছে দেবেন।"

"কেন? তোমাকে পৌঁছে দেবার লোকের অভাব আছে নাকি?" অজয়ের সুরে বিদ্রূপ।

আবার সুমিত্রার বুকটা ধ্বক্‌ করে উঠল। অজয় কেন তাকে এ কথা বলবে? সঙ্গে সঙ্গে তার রাগও হল। সেও বক্র জবাব দিল, "তা হয়তো নেই, তবুও আপনি যদি..."

"থাক, আমাকে আর কৃতার্থ করতে হবে না।"

"ওঃ, তাই নাকি! আচ্ছা, চল্লাম তাহলে।" সুমিত্রা চলে যাচ্ছিল, কি ভেবে আবার ঘুরে এসে বলল, "মাথাটা ঠিক আছে তো?"

"তার মানে?" ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অজয় বলে উঠল।

"ঐ আর কি। সেদিন দুপুরবেলা অফিসে হঠাৎ যেমন হয়েছিল, সেই রকম..."

"দেখ সুমিত্রা, তার জন্যে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চেয়েছি এবং চিরকাল চাইব। কিন্তু তা' বলে ও নিয়ে বিদ্রূপ করাটা কি ভাল?"

"ভাল মন্দের কথা তো বলছিনে। খালি জিজ্ঞেসা করছিলাম মাথাটা ঠিক আছে তো ? যাক্‌গে এখন ঝগড়ার সময় নেই। যাচ্ছি।"

"দাঁড়াও, কথাটা যখন তুললেই তা হলে শুনে যাও। আমি আমার নিজের ওজন বুঝিনে এমন নয়। আমার সীমা কদ্দূর তাও আমি জানি। তবুও তা অতিক্রম করে ফেলেছিলাম, বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম। তোমার কাছে আমি আবার ক্ষমা চাইছি, সুমিত্রা।"

"দেখি চিন্তা করে ক্ষমা করতে পারি কিনা। আমার আর এখন দাঁড়াবার সময় নেই।"

সুমিত্রা বাসে উঠে পড়ল। বাসটা যতক্ষণ না দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, অজয় ততক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

মিত্রসাহেবের ব্যবহার, অজয়ের অভিমান এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সব কিছু মিলে সুমিত্রাকে একেবারে আকুল করে তুলল। এত কঠিন সমস্যায় জীবনে সে আর পড়ে নি। দৃঢ়ভাবে, সঙ্কল্প অটুট রেখে অগ্রসর হতে না পারলে সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। অথচ তাকে পরামর্শ দেয়, সাহায্য করে এমন কেউ নেই। একক সংগ্রামে তাকে জয়ী হতে হবে। সে তার কর্ম্মপন্থা স্থির করে ফেলল। প্রথমে অজয়ের জন্য অন্য কোথাও একটা চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে। মিত্রসাহেবের নানা জায়গায় বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। তাঁকে দিয়েই এই কার্য্য উদ্ধার করতে হবে। তারপর মিত্রসাহেব, তাঁকেও উপযুক্ত জবাব দিতে হবে।

সেদিন সুমিত্রা প্রথমেই অফিসে গিয়ে মিত্রসাহেবের সঙ্গে অজয়ের কথা পাড়ল, "মিঃ মিত্র, আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।"

"বেশ তো, বলুন না।"

"এদিককার কাজ কর্ম্ম তো আমি অনেকটা শিখে নিয়েছি।"

"নিশ্চয়ই।"

"তাই বলছিলাম কি অজয়বাবুকে আর কি দরকার?"

"বেশ, তিনি এস্টাব্লিশমেণ্টেই থাকুন।"

"সেই সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে।"

"আহা বলুন না। আমার কাছে স্বচ্ছন্দে আপনি যে কোন কথা বলতে পারেন।"

"অজয়বাবুর মত qualification-এর লোককে এস্টাব্লিশমেণ্টে রাখা অফিসের দিক থেকে উচিত নয়। তার চেয়ে কম মাইনের একজন লোক নিয়ে নিলেই হয়।"

"Many thanks Miss Dutta, এ-কথাটা আমার মাথায় আসে নি। আমার অফিস সম্পর্কে আপনি এত interest নিচ্ছেন, I am so glad."

"তাহলে অজয়বাবুকে সে কথা বলে দেওয়াই ভাল।"

"হ্যাঁ, এক্ষুণি বলে দিচ্ছি।"

"কিন্তু আরও একটা কথা আছে।"

"আহা বলুন না, এত সঙ্কোচ করছেন কেন?"

"একজনকে হঠাৎ এই বাজারে ছাড়িয়ে দেওয়াটা দেখতে কেমন লাগে।"

"বেশ, আমি তাঁকে তিনমাসের মাইনে দিয়ে দিচ্ছি। তিনমাস তিনি চেষ্টা করতে থাকুন।"

"তা আজকাল চেষ্টা করলেই কি চাকরী পাওয়া যায়? একটু ধরা করা চাই।"

"তা আমি কি করতে পারি?"

"ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের—অফিসে একটা চাকরী খালি আছে। মাইনেও ভাল, prospectও বেশ। আপনার তো ওখানকার Controller-এর সঙ্গে···

"Alright, আপনি অজয়বাবুকে বলবেন একটা দরখাস্ত করতে, আমি ব্যবস্থা করব!"

"খুবই ভাল কথা।"

"আর অজয়বাবুকে আমি একটা নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি, বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিন।"

নোটিশ লিখে দিয়ে মিত্রসাহেব কাজে বেরিয়ে গেলেন। সুমিত্রা একজন বেয়ারাকে দিয়ে নোটিশটা অজয়ের হাতে পাঠিয়ে দিল এবং পরবর্ত্তী দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল।

অজয় বেয়ারাকে জিজ্ঞেসা করল, "এটা তোমার হাতে কে দিয়েছেন?"

"মেমসাহেব।"

"তিনি কি এখন আছেন?"

"জী, হ্যাঁ।"

"সাহেব।"

"চলা গিয়া।"

"আচ্ছা, তুমি যাও।"

চাকরী যাওয়াতে যতটা নয় সুমিত্রাই এর মূলে এ' কথাটা ভেবে অজয় ভয়ানক ক্ষুব্ধ হলো। কি ক্ষতি সে সুমিত্রার করেছে যার জন্যে এত বড় একটা সর্ব্বনাশ সে তার করল। মিত্রসাহেবের সঙ্গে যা খুসী করতে সুমিত্রাকে তো সে বারণ করেনি। তবে? যাক্‌, একবার শেষ জিজ্ঞেসা করে আসা যাক। পরক্ষণেই আবার ভাবল, কি হবে? শুধু একবার কৃপার দৃষ্টিতে তাকাবে বৈ তো নয়? তবুও দেখা যাক।

সুমিত্রা জানত যে অজয় আসবে। সে ঘরে ঢুকতেই সুমিত্রা আগ্রহ করে বলল, "বসুন, অজয়বাবু।"

"ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদ না হয় পরেই দেবেন, এখন একটু বসুন তো, দরকার আছে।"

"জুতো দান হবে নাকি?"

"তার মানে!"

"মানে জানিনে, তবে আগের কথাটা হচ্চে গরু মেরে।"

"ওঃ বুঝলাম!"

"বুঝবেন বৈকি, আপনি বুদ্ধিমতী মেয়ে!"

এই ধরনের কথাবার্ত্তা হবে সুমিত্রা তা অনেকটা আগেই অনুমান করেছিল। তাই সে বিচলিত হলো না। অজয়ের আপনি সম্বোধনে বরং তার হাসি পেল। সে বলে

উঠল, "তাহলে আমি বুদ্ধিমতী মেয়ে এটা তুমি স্বীকার করছ তো ?"

সুমিত্রার এই তুমি সম্বোধনে অজয় বিস্মিত হলো। পরক্ষণেই ভাবল সুমিত্রা বোধহয় তাকে ঠাট্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, "আপনি কি আমাকে বিদ্রূপ করছেন ?"

"কেন এতে বিদ্রূপের কি হলো !"

"জানেন, আপনার মনিব মিত্রসাহেব পর্য্যন্ত আমাকে তুমি বলেন না।"

"তাতে আমার কি ! মিত্রসাহেব কাকে আপনি আর কাকে তুমি বলেন তাতে আমার কি এসে যায় ?"

"তা' অবশ্য ঠিক। মিত্রসাহেব বোধহয় আপাততঃ আপনার অধীনেই আছেন।"

অজয়ের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সুমিত্রা আহত হলো তবুও বিচলিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে দিল না। একই সুরে সে বলতে লাগল, "তা' কে কার অধীনে আছে বলা শক্ত। তুমিও তো আমার অধীনে থাকতে পার।"

"দেখুন, মিস্ দত্ত, সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে।"

"সেটা তোমারও জানা উচিত।"

"আমি সেটা লঙ্ঘন করেছি এমন কোন প্রমাণ আছে ?"

"আছে বৈকি।"

"যথা।"

"আমাকে আপনি এতদিন তুমি বলছিলেন হঠাৎ 'আপনি' বলতে আরম্ভ করলেন কেন? এটা কি বিদ্রূপ নয়?"

অজয় আবার বিস্মিত হলো, "তুমি বলবার অধিকার আপনিই দিয়েছিলেন।"

"সেটা কি কেড়ে নিয়েছি?"

"দেখুন মিস্ দত্ত, আমি একটু বোকা লোক, তাই আপনাকে ঠিক ধরতে পারছিনে।"

"বোকা লোকদের বোকার মতই থাকা উচিত। এই একটু আগে না বলছিলে যে আমি বুদ্ধিমতী? তবে আমার কথামতই চল না কেন?"

অজয় অনেকটা নরম হয়ে এলো। তবুও বিস্ময়ের সুরে বলল, "আপনার কথামত!"

"হ্যাঁ, আমার কথামত। নিজে কি ক্ষমতাবান পুরুষ জান না?"

"কি করতে হবে?"

"এই ঠিকানায় একটা দরখাস্ত করতে হবে। এখনি টাইপ করে আমাকে দিয়ে যাও।"

"হ্যাঁ, ওখানে একটা ভাল চাকরী খালি আছে। গত রবিবারে অমৃতবাজারে বিজ্ঞাপন দেখেছি। ভাবছিলাম একটা দরখাস্ত করব! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত......"

"আর হয়ে উঠল না।"

"ঠিক তা নয়। দরখাস্ত করে কি হবে? মুরুব্বী কোথায়?"

"ঠিক আছে তুমি দরখাস্তটা এক্ষুণি শেষ কর। মুরুব্বী পেয়েছি।"

"কে?"

"কেন? আমাকে মুরুব্বী মানতে আত্মসম্মানে লাগে বুঝি?"

অজয় এবারে হেসে ফেলল, "আচ্ছা, দিচ্ছি।"

"আর শোন, পরশু এক রবিবার, তার পরের রবিবারে আমি তোমাদের বাড়ি যাব, অনেক ব্যাপার আছে।"

"আচ্ছা।"

দরখাস্তটা সুমিত্রার হাতে দিয়ে অজয় চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে আবার সুমিত্রার চেয়ারখানি একেবারে ঘেঁষে দাঁড়াল। সুমিত্রা উপরের দিকে তাকাল। অজয় পরম স্নেহে সুমিত্রার দু' গালে দু'টি হাত রেখে বলল, "সুমিত্রা, আমার উপর তুমি রাগ করেছ?"

"খুব।"

"কেন?"

"আমার সঙ্গে তুমি ঝগড়া কর কেন?"

"আর করব না।"

সুমিত্রা অজয়ের হাত দু'টির উপর নিজের হাত রাখল এবং নিজের গালে আরও জোরে অজয়ের হাতের চাপ খেল। তার-পরে এক সময় পরম আরামে তার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এলো।

সুমিত্রা স্বপ্ন দেখে। নারীর চিরন্তন বৃত্তি তার মনে জেগে উঠে। কয়েক বছরের কঠোর জীবন সংগ্রাম তার সমস্ত কোমল বৃত্তিতে ধ্বংস করে ফেলেছিল। এখন তারা আবার আস্তে আস্তে দেখা দেয়। সকল কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও তার মনের কোণে সব সময় ফুটে উঠে শান্ত গৃহের একখানি ছবি। সেখানে সে অধিশ্বরী, তার হুকুম তথায় অলঙ্ঘনীয়। অজয়কে সে কোন কাজ করতে দেবে না। আহা! বেচারা!

প্রায় সে কাজ গুছিয়ে এনেছে। মিত্রসাহেবকে খতম করবার পরিকল্পনাও ঠিক। দেখা যাক, কতদূর কি হয়।

কিন্তু অজয় সব সহ্য করবে তো? বিগড়ে যাবে না তো? না, তা' সে হতে দেবে না। তাহলে একমাত্র আত্মহত্যা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবে না।

তিনচারদিন পরের কথা। অজয়ের চাকরী হয়ে গিয়েছে। দেখা করবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরীটা তার হয়ে গেল, কোন ফর্ম্মালিটির প্রয়োজন হয় নি।

অজয় ভাবল সুমিত্রার সঙ্গে একবার দেখা করে আসা যাক। ওর জন্যেই তো হলো। কিন্তু মিত্র এণ্ড কোম্পানীর অফিসে যেতে আর তার ইচ্ছে হলো না। ডালহৌসী স্কোয়ারে ঐ অফিসের কাছাকাছি একটা জায়গায় সে দাঁড়িয়ে রইল। সুমিত্রা বেরুলেই দেখা করবে। প্রথম দিন হলো না, পরের দিন দেখা পাওয়া গেল।

"এখানে না, চল এসপ্লানেডের দিকে যাই," সুমিত্রা বলল।

"তাই চল।"

কার্জ্জন পার্কে এসে তারা বসল।

"তারপর অজয়, তোমার কি খবর?" মহা মুরুব্বীর মত সুমিত্রা কথা আরম্ভ করল।

"তা' আপনার কৃপায় ভালই।"

"বেশ, বেশ! এখন মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কর!"

"যে আজ্ঞে।"

"তারপর, আমাদের অফিসের সামনে কি জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলে?"

"তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।"

"হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে তোমার ইচ্ছে হলো?"

"তা হবে না? একটা কৃতজ্ঞতা বোধ আছে তো।"

"ও, তা হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই এসেছিলে।"

"অনেকটা তাই, তবে সবটা নয়।"

"বাকিটা কি ?"

"তুমি তো জান, তবে কেন জিজ্ঞেসা করছ ?"

"না, তবুও শুনতে চাই !"

অজয় ইতস্ততঃ করতে লাগল। তারপর এক সময় বলে ফেলল, "দেখ সুমিত্রা, সত্যি কথা বলতে কি, দিনে তোমার সঙ্গে অন্ততঃ একবার দেখা না হলে ভাল লাগে না। কি যে হলো, ঘুমুবার সময় তোমার চিন্তা, ঘুম থেকে উঠেও তোমার কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলতে পারিনে। মহা-মুস্কিলে পড়া গেছে।

"মুস্কিল আবার কিসের ?"

"মুস্কিল নয় ? রোজ তোমার দেখা পাব কোথায় ?"

"কেন পাবে না ? আমাদের বাড়ি গেলেই পার।"

"তোমার মা থাকলে যেতাম। এখন গেলে কে কি মনে করে। তারপর লজ্জাও করে।"

"আমার কাছেও লজ্জা করে ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কাছে আবার লজ্জাটা কিসের ?"

"তাও বটে, তোমার কাছে আবার লজ্জা কিসের ? তাই বলছিলাম সুমিত্রা···" অজয় আর বলতে পারল না।

"কি বলছিলে বল না ?"

"না থাক্, তুমি আবার কি ভাববে।"

"দেখ, ন্যাকামী ছাড়।"

"বলছিলাম কি সুমিত্রা তুমি আমার মাথাটি খেয়েছ।"

"তার মানে," সুমিত্রা হেসে ফেলল।

"দূর! সব সময় কি চিন্তা বলতো। সব কাজকর্ম্ম চুলোয় গেছে। খালি একজনের চিন্তা।"

"তা সে চিন্তা ছেড়ে দিলেই পার।"

"কি করে ছাড়ি?"

"তোমার কি ছাড়বার ইচ্ছে আছে? বল, তোমায় আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।"

"তুমি তো বলবেই। তোমাদের তো আর মন বলে কিছু নেই।"

"সেটা আমরাই জানি। তোমাদের কাছে তা বলতে যাব না।"

"সত্যি, আমার ভারি বিশ্রী লাগছে।"

"কেন?"

"এই তো তুমি না বলে থাকতে পারলে। আমি বোকার মত সব বলে ফেলেছি। ভয়ানক প্রেষ্টিজে লাগছে।"

"প্রেষ্টিজে নয়, বল পৌরুষে লাগছে।"

"অনেকটা তাই।"

"সব পুরুষেরই পৌরুষ একদিন এইভাবে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তাতে লজ্জার কি আছে?"

"বাঃ, লজ্জা নয়? কই তুমি তো কিছু বললে না?

"তুমি কি বোকা! মেয়েরা কখনও প্রেম নিবেদন করে নাকি?

"সত্যিই তাই। মেয়েরা যেন ইঁদুর ধরা কল। কলতো আর ইঁদুরকে ডেকে আনে না। ইঁদুর ইচ্ছে করে এসেই ধরা পড়ে।"

"কিন্তু ইঁদুর ধরা পড়লে কল কি আর তাকে ছেড়ে দেয়?"

"না, তা' অবশ্য দেয় না।"

"তবে এত ভাবছ কেন?

"তুমি আমাকে ছাড়বে না তো?"

"এত বোকার মত কথা বল কেন?"

"না বলে থাকতে পারছি কই? রোজ রোজ তোমার দেখা আমি পাব কোথায়?"

"আমিই না হয় দেখা করব।"

"তুমি কোথায় দেখা করবে?"

"তোমাদের বাড়িতে।"

"বাঃ, তা' কি করে হয়? রোজ যাবে আবার আসবে সেটা কেমন হয়?"

"তা হলে যাব, আর আসব না।"

"তোমাদের বাড়িতে ওদের কে দেখবে?"

"তুমি দেখতে পারবে না?"

এবার অজয়ের মাথা সাফ হয়ে গেল। সে উত্তেজনায় সুমিত্রার একটা হাত চেপে ধরল, "নিশ্চয় পারব, সুমিত্রা। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।"

"বেশ, এখন চল বাড়ি যাওয়া যাক।"

"না সুমিত্রা, আজ আর বাড়ি যাব না। চল ঘুরে বেড়াই।" অজয় উৎসাহের আতিশয্যে কি যে করবে বুঝে উঠতে পারল না।

"আহা ছাড় না। চারদিকে লোক রয়েছে।"

দুজনেই ট্রাম ধরতে গেল। যেতে যেতে সুমিত্রা বলল, "সামনের রবিবার আমি যাব, বাড়ি থেকো।"

"রবিবার অনেক দেরী, কালই চল না।"

অজয়ের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রার ইচ্ছে হলো এখনই তার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু তার যে এখনও অনেক কাজ বাকি।

"ঠিক আছে, রবিবারেই যাব।"

বিপরীতমুখী ট্রামে উঠে দু'জন চলে গেল।

আজ কলুটোলা যাওয়ার কথা। অফিসে আসতেই মিত্রসাহেব সব বুঝিয়ে দিলেন। মিত্রসাহেবের গাড়ী করে সুমিত্রা কলুটোলায় এসে হাজির হলো। সাদর অভ্যর্থনায় সুমিত্রার ভয় অনেকটা কেটে গেল।

শেঠ মাগনীলাল এই কারখানাটির মালিক। তিনি সুমিত্রাকে পরম সমাদরে তার চেম্বারে এনে বসালেন, চা খেতে দিলেন এবং অনেক রকম গল্প করলেন। সুমিত্রার রূপযৌবনের প্রশংসাও যথেষ্ট হলো। শেঠজী সুমিত্রাকে জানালেন যে, সে যেন শেঠজীকে নিজের দোস্ত বলে মনে করে। যে কোন সময় থোড়া ইয়াদ করলেই তিনি সুমিত্রার জন্যে জান লুটিয়ে দিতে পারবেন।

সুমিত্রা এমন একটা ভাব দেখাল যেন সে খুবই আপ্যায়িত হয়েছে। শেঠজী কিছুতেই তাকে ছাড়তে চান না। অবশেষে সুমিত্রা না বলে পারল না, "শেঠজী, আমার আরও কাজ আছে, এবার উঠি।"

"হা, হা, সে বাততো ঠিক। কাম যব আছে তো

যানাই চাহিয়ে।” এই বলে নগদ চল্লিশ হাজার টাকার নোট গুণে তিনি সুমিত্রার হাতে দিলেন এবং আরও পাঁচশো টাকা সুমিত্রাকে ‘পাণি পিনেকে লিয়ে’ দিলেন। সুমিত্রা নিতে চায় না, শেঠজীও ছাড়বেন না। বাধ্য হয়েই নিতে হলো।

ফটক পর্য্যন্ত শেঠজী সুমিত্রাকে এগিয়ে দিলেন। যাবার সময় ইংরাজী কায়দায় সুমিত্রার ডান হাতখানি চেপে ধরে আবার আসতে অনুরোধ জানিয়ে দিলেন। সুমিত্রা হাতটা তাড়াতাড়ি রুমালে বেশ ভাল করে মুছে ফেলল এবং নিশ্চয়ই আসবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল। মনে মনে বলল, “আমি আসব না, বেশ ভাল লোকই পাঠাব।”

অফিসে এসে সুমিত্রা দেখে যে মিত্রসাহেব খুব আগ্রহ-সহকারে তারি প্রতীক্ষায় বসে আছেন। সব কথা বলে সুমিত্রা চল্লিশ হাজার টাকার নোট মিত্রসাহেবের টেবিলের উপর রাখল। মিত্রসাহেব একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, “দেখলেন, মিস্ দত্ত, আমি গেলে বেটা ত্রিশ হাজারের এক আধলাও বেশী দিত না। Cheer up! এই দশ হাজারের পাঁচ হাজার আপনার।” এই বলে তিনি সুমিত্রাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইলেন।

“না, না, আমি নেব কেন? আপনার টাকা আপনিই রাখুন।”

"আমার টাকা কি আপনার টাকাও নয়? আপনাকে নিতেই হবে।" মিত্রসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দুই হাতে সুমিত্রাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার জামার নীচে পাঁচ হাজার টাকার নোট গলিয়ে দিলেন। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়াতে চাইল। কিন্তু মিত্রসাহেবের সঙ্গে পারবে কেন? তিনি অজস্র চুম্বনে সুমিত্রাকে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন। রাগে অপমানে সুমিত্রার সর্ব্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। প্রতিশোধের স্পৃহা সহস্র গুণ বেড়ে গেল।

"মিস্ দত্ত, ঐ যে দেওয়ালের গায়ে সেফ্‌টা আছে তাতে এই টাকাগুলো রেখে দিন।"

কোন কিছু না বলে সুমিত্রা সেফ্‌টা গিয়ে খুলল। দেখল তাতে আরও অনেক টাকা রয়েছে। এই ঘরে বসেই সে কাজ করে। অনেক সময় একলাও থাকে। তার কেমন যেন ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগল না। সে বলল, "এতগুলো টাকা এখানে রয়েছে, এগুলো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিন না?"

হা, হা করে মিত্রসাহেব হেসে উঠলেন "তা' হলেই হয়েছে।"

"কেন?"

"পুলিশ নামে একটা জীব আছে সেটার খোঁজ রাখেন?"

"পুলিশের এতে বলবার কি আছে ?"

"যথেষ্ট আছে, সে আপনি বুঝবেন না।"

"তা' হলে টাকাগুলো কি এখানেই থাকবে ?"

"না, তা' থাকবে না। আপাততঃ এখানেই আছে। এখন আছে নোটে অর্থাৎ কাগজে, শীঘ্রই সোণায় পরিণত হবে।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"বোঝা একটু শক্ত। টাকাগুলো রাখব কি করে ? যে কোন সময়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো ? আজকাল বেনামী-তেও property কিনবার উপায় নেই। ফেউয়ের মত Enforcement Branch লেগে আছে। অবশ্য তাদেরকে ঠাণ্ডা করতে আমরা জানি। কিন্তু বড় ঝামেলা। তার চেয়ে সোণা করে রাখলেই সব হাঙ্গামা মিটে যায়। যে কোন সময় আবার টাকায় পরিণত করাও যাবে।"

"ও।" বলে সুমিত্রা চুপ করে থাকল।

"হ্যাঁ, দেখুন মিস্ দত্ত, আপনি হলেন গিয়ে আমার অফিসের গিন্নী, তাই চাবিটা আপনিই রেখে দিন। আমি এখন চল্লাম।"

যাবার সময় আবার সুমিত্রাকে চুম্বন দান করে মিত্র-সাহেব চলে গেলেন।

সমস্ত জগৎ সুমিত্রার চোখের সামনে শত্রু শিবিরে পরিণত হলো। আর সহ্য করা যায় না। আর এক মুহূর্ত্তও মিত্রসাহেবের সঙ্গে থাকা চলবে না। মিত্রসাহেব ধরে

নিয়েছেন সুমিত্রা তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। এবার তাকে নিয়ে যা খুসী তাই করা চলবে।

পরের দিন অফিসে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই মিত্র সাহেব এলেন।

"এই যে, মিস্ দত্ত, এসে গিয়েছেন দেখছি।" নিজের আসনে যেতে যেতে মিত্র সাহেব সুমিত্রার গালটা টিপে দিয়ে গেলেন।

"আপনি কি আজ বেরোবেন নাকি?"

"হ্যাঁ, পরশু আমাকে বোম্বে যেতেই হবে। তাই আজ কিছু কাজ সেরে আসতে হবে। কেন?"

"আমাকেও বেরোতে হবে?"

"তা' বেশ তো চলুন না।"

"না, আজ আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।"

"তবে থাক্, আমি আসছি।"

অল্পক্ষণ পরেই মিত্র সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

আবার সুমিত্রা ভাবনায় পড়ল। কাজটা কি ঠিক হবে? পরক্ষণেই তার মন চীৎকার করে বলে উঠল, এতে পাপ কিছুই নেই। শঠে শাঠ্যং।

সুমিত্রা প্রথমে মিত্র এণ্ড কোম্পানীর গোপন কাগজপত্র সব গুছিয়ে তার ব্যাগে পুরলো। তারপর সেফটা খুলে সব টাকা বের করে নিল। তার বুকটা ধ্বক ধ্বক করে কাঁপতে লাগল। বারেবারেই অজয়ের মুখ, তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। না, কর্ত্তব্য স্থির!

সুমিত্রা অফিস থেকে বেরিয়ে সটান লালবাজারে চলে এলো। দৃঢ়পদবিক্ষেপে সে পুলিসের বড় কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং নিষ্কম্প কণ্ঠস্বরে সব কিছু তাঁকে জানাল। গোপন কাগজপত্রগুলোও তাঁর হাতে সমর্পণ করল। বড়কর্তা সুমিত্রাকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন এবং আশ্বাস দিলেন যে এই ব্যাপারে সুমিত্রার যে হাত আছে তা কেউ জানতেও পারবে না।

*　　　*　　　*　　　*

পরের দিন সংবাদ পত্রে ফলাও করে বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যবসায়ীর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশিত হলো। অজয় বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল এবং সুমিত্রাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

তাকে দেখেই সুমিত্রা বলল, "তুমি এসেছ?"

"কি ব্যাপার, সুমিত্রা ?

"সব বলব, তবে এখন নয়।"

"না, এক্ষুণি বল।"

"না, তুমি এখন চলে যাও। কাল তোমার ওখানে আমি যাব।"

তবু অজয় পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু সুমিত্রা তখনি কিছু বলতে রাজি হলো না। শেষে বাধ্য হয়ে সে চলে এলো।

সারা দিনরাত ছটফট করে অজয় কাটাল। পরের দিন

বারেবারে বারান্দায় গিয়ে সুমিত্রা আসে কিনা দেখতে লাগল।

প্রায় বারোটার সময় সুমিত্রা এলো। কড়া নাড়তেই দৌড়ে গিয়ে অজয় দরজা খুলে দিল। সুমিত্রা একটু হাসল। অজয় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল "কাকে চাই?"

"অজয় রায়কে। তিনি কি বাড়ি আছেন?"

"আছেন, আসুন।" হাসতে হাসতে অজয় সুমিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

"এই করছ কি? রমা এক্ষুণি দেখে ফেলবে।"

"একেবারে নিশ্চিন্ত। কেউ বাড়ি নেই।"

"কোথায় গেল সব?"

"বেলঘরিয়া, বড়দি'র ওখানে।"

"তা' তুমি গেলে না?"

"আমি তো মহারাণীর আগমন প্রতীক্ষায় আছি।"

সুমিত্রা অজয়ের বিছানায় গিয়ে বসল। আজ চেয়ারে না বসে অজয় সুমিত্রার পাশে গিয়েই বসল। এবং একবার তার চুল ধরে একবার আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগল। সুমিত্রা কৃত্রিম বিরক্তির সুরে বলল, "আহা, একটু চুপ করে বস না, অনেক কথা আছে।"

"হ্যাঁ, আগে তাই বল। মিত্রসাহেব কি করে কাবু হলেন।"

সুমিত্রা চট করে কিছু বলতে পারল না। সে চুপ করে রইল।

"আহা, বলই না।"

অবশেষে অশেষ সাহস সঞ্চয় করে সুমিত্রা পূর্ব্বাপর সমস্ত কাহিনী অজয়ের কাছে বিবৃত করল। খুঁটিনাটিও সে বাদ দিল না। এমন কি মিত্রসাহেবের চুম্বন দানের কথাও সে উল্লেখ করল।

সব কিছু শুনে অজয় যুগপৎ হতভম্ব, বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেল। বারেবারেই সে সুমিত্রার দিকে তাকাতে লাগল। সুমিত্রা মুখ নীচু করে বসে রইল। বহুক্ষণ নীরবে কাটল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সুমিত্রা দেখল সমস্ত আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে আর অজয় সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সুমিত্রাই প্রথমে কথা বলল, "কই, তুমি কিছু বলছ না তো।"

"না, ভাবছি তোমার কি সাহস?"

"কিন্তু এছাড়া উপায় কি ছিল?"

"সব কিছুই ভাল কাজ করেছ। যে কাজটা আমাদের করার কথা ছিল তাই তুমি করেছ আমি খালি ভাবছি টাকাটার কি হবে?"

"কেন, আমাদের থাকবে?"

"তা' কি করে হয়?"

"কেন হয় না?"

"অসদুপায়ে অর্জ্জিত টাকাতে কি আমরা ভাগ বসাতে পারি?"

"তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারছিনে। তার অফিসে আমরা চাকরী করি। সবাই জানি যে আমাদের মাইনেটাও অসদুপায়ে অর্জ্জিত টাকা থেকে দেওয়া হয়। তা' নিতে তো আমাদের বাধে না।"

"সেটা আমরা পরিশ্রমের বিনিময়ে পেয়ে থাকি।"

"পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা যা পাই তাতে মাসের দশদিনও চলে না। প্রতিমুহূর্ত্তেই আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এই টাকা থেকে আমাদের ন্যায্য পাওনাটাই শুধু আদায় করে নিচ্ছি।"

"ঠিক এভাবে দেখলে তো চলবে না। তুমি সুযোগ পেয়েছ প্রতিশোধ নিয়েছ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিনিয়ত বঞ্চিত, শোষিত হচ্ছে তাদের কথাও ভাবতে হবে। সমগ্র সমাজকে চোখের সামনে রেখে তবে কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে।"

"বুঝলাম তো বড় বড় কথা। সমাজ আমার জন্যে কি করেছে? আমি যদি না খেতে পেয়ে মরি তবে সমাজ দেখতে আসে?"

"আসবে। যদি আমরা সমাজকে সে রকম করে গড়ে তুলতে পারি।"

"তার জন্যে আরও সাতপুরুষ অপেক্ষা করতে হবে।"

"তা' হয়তো হবে, কিন্তু উপায় কি?"

"তাহলে আমরা পচেই মরব।"

"তা' কেন, চেষ্টা করে দেখতে হবে।"

"পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে যদি আশা করি, যে একদিন তা ভাঙবে তবে মাথা খুঁড়েই মরতে হবে। দেওয়াল কোন দিনই ভাঙ্গবে না। তার চেয়ে যন্ত্র দিয়ে দেওয়াল ফুটো করাই ভাল।"

"ফুটো দিয়ে একজনই গলতে পারে, বাকি সবাই আটকে থাকবে।"

"বাকি সব যদি চেষ্টা না করে।"

"তাদের চেষ্টা করতে উদ্যোগী হতে হবে।"

সুমিত্রা চুপ করে থাকল। অজয়ই আবার বলে চলল, "দেখ সুমিত্রা সব কিছুই বুঝতে পারি তবু কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারিনে। এই মাত্র বলছিলাম তুমি ভাল কাজই করেছ। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তুমি একটা উদ্দেশ্য নিয়েই একাজে হাত দিয়েছিলে। এবং তা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে। স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেছে তাই তুমি মনে করছ উপায়টা যাই থাকুক না কেন কিছুই এসে যায় না। কিন্তু ধর যদি বাধা পেতে।"

"যেমন।"

মিত্রসাহেবের লক্ষ্য ছিল তোমার রূপ ও যৌবনের প্রতি। যদি তিনি তোমাকে ছেড়ে না দিতেন।"

"আর কিছুদিন থাকলে নিশ্চয়ই ছাড়তেন না।"

"সেটা তোমার হিসাব মত চলেছে বলেই না। যদি

তোমার হিসাবে ভুল হত? প্রথম যেদিন ক্লাবে গিয়েছিলে সেই দিনই যদি তিনি.........।”

“কি আর করতাম? সেটাকেও মেনে নিতে হত।”

“সেটা কি ভাল?”

“হয়তো নয়, কিন্তু সতী সেজে ঘরে বসে থাকলেও তো পেট ভরবে না।”

“তা আমি জানি, সুমিত্রা। আমাদের নীতির সীমা আজ ক্রমশঃই সরে যাচ্ছে। তাকে আর রেখায় আবদ্ধ করা যাচ্ছে না। এমন একদিন ছিল যখন মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ বলে গণ্য হত। কিন্তু আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। থু থু ফেলার মত মিথ্যে কথাকেও আজ আমরা গ্রাহ্য করিনে। সতীত্বের বেলাতেও হয়েছে তাই।”

“তুমি কি আমার চরিত্রে সন্দেহ করছ নাকি?”

“ছিঃ, এই তো চটে গেলে।”

“দেখ অজয়, এত কথা আমি বুঝিনে। আমি চাই শান্তি, আমি চাই গৃহ, আমি চাই মনের মত সঙ্গী। এমন একদিন ছিল যখন কোন মেয়েকেই এ সবের জন্যে চিন্তা করতে হত না। বাপ মা সমাজ, তারাই এর ব্যবস্থা করে দিতেন। আজ আর সেদিন নেই। হতাদরে যৌবন চলে যায়। পিতামাতা অসহায়, সমাজ দর্শকমাত্র। কিন্তু মনটা তো একই আছে। স্বপ্ন তো এত সহজে চূর্ণ হয়ে

যেতে পারেনা। তাই যদি কেউ নিজেরটা নিজেই গুছিয়ে নেয় তবে আপত্তি কিসের? যে সমাজ মরলেও মুখ ফিরিয়ে দেখে না তার মতের মূল্য কি? সহজ ভাবে যেখানে বাঁচা যায় না সেখানে বাঁকা পথ ধরা ছাড়া উপায় কি? সবাই তো আর আদর্শ আঁকড়ে মৃত্যুর দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যেতে পারে না?"

"হয়তো তাই।" একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অজয় জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার হয়ে গেছে। ক্ষান্ত-বর্ষণ আকাশে মেঘের ছায়ায় চাঁদ লুকোচুরি খেলছে। অজয় তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। সুমিত্রা গিয়ে অজয়ের পাশে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ উভয়ই নীরব রইল।

"চল সুমিত্রা, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"আমি যে তোমার এখানেই থাকতে এসেছি।" দুই হাতে সুমিত্রা অজয়ের বাহু বেষ্টন করে তার বুকে মুখ লুকোল। অজয় ধীরে ধীরে পরম স্নেহে সুমিত্রার মাথায় হাত রাখল। খণ্ড মেঘের ছায়া থেকে হঠাৎ চাঁদ মুক্ত আকাশে বেরিয়ে এলো।

STATE CENTRAL LIBRARY W.B.
VIP Road, Calcutta